শনিবারের চিঠি

১১ ফাল্গুন ১৩৯১ □ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

অন্নদা মুনশী স্মরণে

বইমেলার প্রেক্ষাপট □ শিল্পীদের কলেজ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত)।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত)।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত)।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভূক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

* বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত রবীন্দ্র–রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা–২৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা–৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত।। অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ রায়।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি।। বনফুল।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ড: সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস –বনফুল হাটেবাজারে ৮ টাকা।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা।। অধিক লাল ১০ টাকা।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু বাসর ঘর ১০ টাকা।। লাল মেঘ ১০ টাকা।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা।। যখন বসন্ত ১০ টাকা।। স্মৃতি সততই সুখের।। (আমেরিকা ও ইউরোপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদবধূ ১২ টাকা।। কর্ণাটরাগ ৮ টাকা।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা।।

* কবিতা –অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা।। নীল আকাশ ৮ টাকা।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু শীতের প্রার্থনা-বসন্তের উত্তর ১০ টাকা।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট।। কলিকাতা-৭৩

অন্নদা মুন্সী স্মরণে □ দুর্গারতন দত্ত ৫
বাঙালীর উৎসবের চৌদ্দপার্বণ বইমেলার প্রেক্ষাপট □ পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য ১১
শিল্পীদের কলেজ ও বামফ্রন্ট সরকার □ শুভাশিস মৈত্র ৩
সরকারী কলেজে শিক্ষকদের বিদ্রোহ □ শিবাজী প্রতিম বসু ১৫
প্রদেশ কংগ্রেসের মহাকাশে নতুন জ্যোতিষ্ক □ বিশেষ সংবাদদাতা ২৪
অশোক সেনের চিন্তাধারা □ ২২
বিশ্বব্যাংকের ১১০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতছাড়া □ নিজস্ব প্রতিনিধি ২৬
হকার উচ্ছেদে সরকার মরীয়া □ বিশেষ প্রতিনিধি ২৭
দত্তাবাদের দুঃখ □ নিজস্ব প্রতিনিধি ২৯
'ভুড' □ ভবেন ঘোষ ৩০

লালবাড়ির রহস্য □ কমল ৩২
রাজনীতির নেপথ্যে □ গোবর্ধন মিত্র ৩৪
কলকাতার একটি মুমূর্ষু হাসপাতাল □ অশোক সেনগুপ্ত ৩৫
নাম মাহাত্ম্য □ দিশাহারা শর্মা ৩৬
চিত্রের চারুকলা ও উদিত চিত্রভানু □ স্বরাজ মজুমদার ৩৭
মরজি মহল □ বনফুল ১৭
নূপুরের মত □ অনুলিখন : অনুপমা দাশ ৩৯
গোস্তাকি মাফ করবেন দাদা □ আবু হোসেন ৪৩
পটকা-তত্ত্ব □ ভূপেন্দ্রনাথ সরকার ৪৫
সংবাদ সাহিত্য □ ৪৭

প্রচ্ছদ □ অন্নদা মুন্সী □ গত এবং বর্তমান সংখ্যার ছবি দুর্গারতন দত্ত-র সৌজন্যে প্রাপ্ত

অন্যান্য ছবি □ কবীর আইচ, অলক কুমার মিত্র, প্রবীর দাস জয়ন্ত সাহা, শিশির কর্মকার

অন্নদা মুন্সী নীরবে চলে গেলেন। এই নীরবতা এক ভয়ংকর [illegible] আর অস্বীকারের সাক্ষী হয়ে থাকল। একজন প্রকৃত [illegible] শিল্পী, একজন সার্থক কমার্সিয়াল আর্টিস্ট, আমাদের [illegible] এক মহৎ ব্যক্তিত্ব [illegible] মুন্সীকে নিয়ে এবারের প্রধা[illegible]

আগামী সংখ্যায়

ধর্মের নামে দেশ ভাগ হবার পর থেকে বাঙালীর ইতিহাস কেবল বিতাড়িত হওয়ার ইতিহাস। কখনও আসাম থেকে কখনও ত্রিপুরা থেকে কখনও মরিচঝাঁপি কখনও মানা ক্যাম্প। এই ইতিহাসে আন্দামান একটি নতুন সংযোজন। বাঙালী বিতাড়নের অতি সাম্প্রতিক আন্দামান চিত্রই এই সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

বনফুল প্রকাশণী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা)
প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত।
কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩
দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর,
নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন: ৬১৭৬৭১
ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)
(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যা
১১ ফাল্গুন, ১৩৯১ □ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস, সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ
প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

উচ্চশিক্ষা !
কাজ+সরকার=কংগ্রেসি সরকার
অকাজ+সরকার=অকংগ্রেসি সরকার
ডিভিসি
রাজ্য ইলেকট্রিসিটি বোর্ড
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং
একমাত্র চালু ইউনিট !
রাইটার্স
বন্ধুত্বের হাত !

শিল্পীদের কলেজ ও সরকারের কথা

প্রায় একশ বছরের পুরান ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজটি ধর্মতলা স্ট্রিটের উপর ইঁট কাঠ চুন বালির স্তুপের মত পড়ে আছে এখন। রং তুলি ফেলে দীর্ঘকালের আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে বর্তমানে এক বছরের জন্য ছাত্ররা পেয়েছেন দমদমের মতিঝিল কলেজের একটি তিনতলা বাড়ি। এক বছরের জন্য লিজে নেওয়া হয়েছে এই বাড়িটি। কথা ছিল এই এক বছরের ভিতরেই ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়ি নামের স্তুপটিকে সারাই করে ফেলার। কিন্তু এক বছর শেষ। অথচ স্তুপ এখনও, যা ছিল তাই রয়ে গেছে। অন্যদিকে লিজের চুক্তি অনুসারে দমদমের বাড়িটিকে ব্যবহার করবার সুযোগ এক বছরের বেশি নয়। ক'দিন বাদেই আর একটা জোড়া-তালি মারা পরিকল্পনা নিতে হবে এই সমস্যা থেকে বেরবার জন্য। এটা হল হাজার হাজার নির্বোধ সরকারি কার্যকলাপ এবং কর্তাব্যক্তিদের দায়িত্বজ্ঞানহীন পরিকল্পনার মাত্র একটি উদাহরণ। এই কলেজ চালাচ্ছেন বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী নিযুক্ত প্রশাসক সুনীল দত্ত। সুনীলবাবু ইতিহাসের লোক। সম্ভবত আর্টের ইতিহাস। যদিও ছাত্ররা অভিযোগ করেছেন সুনীলবাবু ডাণ্ডিক কাকে বলে বা এচিং মেশিন কাকে বলে জানেন না। শুধু তাই নয় গত তিন বছরে সুনীলবাবু কলেজে এসেছেন সাকুল্যে তিন বার। তাও আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এছাড়াও প্রশ্ন উঠেছে সুনীলবাবু তিন বছর ধরে কোন্ আইনে প্রশাসক হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন? রবীন্দ্রভারতীর আইনের ১৭(৪) নং উপধারা অনুসারে একজন প্রশাসকের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১৮ মাস। সেক্ষেত্রে সুনীলবাবুর কার্যকাল তিন বছর ছাড়াতে চলেছে।

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে গত ১৫ বছর কাজ চালাচ্ছেন অ্যাকটিং প্রিন্সিপাল। এবং গত ১৫ বছরে এই কলেজটিতে কোন অডিট হয়নি। বিস্তর টাকা-পয়সা নয়-ছয় ঘটেছে এখানে। বছরে দু'লাখ টাকার হিসেবে ১৫ বছরের প্রায় ৩০ লাখ টাকার হিসেবের অডিট না হওয়াটা শিক্ষাক্ষেত্রের জন্যে একটি অত্যন্ত অপমানজনক ঘটনা। এছাড়া ছাত্রদের দীর্ঘতম আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল কলেজ পরিচালনার জন্য একটি

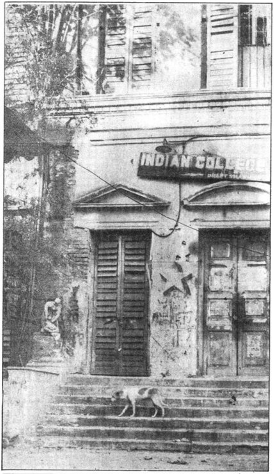

বন্ধ তালা, ভাঙাচোরা দেয়াল, রাজনীতির পোস্টার ভাঙা স্হাপত্য

গভর্ণিং বডি তৈরি। বর্তমান সরকারের আমলে একটি গভর্নিং বডি অবশ্য তৈরি হয়েছিল, তবে সেই গভর্নিং বডির সাতজনের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত হয়েছিলেন গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘ থেকে। এই ঘটনাকে অনেকেই মনে করেছেন রাজনৈতিক ভাবে একটি কলেজ দখল করবার পার্টি-পরিকল্পনা।

কলকাতার অন্য যে আর্ট কলেজটি থেকে ছাত্রদের ডিগ্রি দেওয়া হয়ে থাকে তার সঙ্গে এই কলেজটির শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষাক্রমে কোন তফাৎ আছে বলে কলেজের ছাত্ররা মনে করেন না। অথচ যেখানে ডিগ্রি কলেজে ১০ জন ছাত্র পিছু আছেন একজন শিক্ষক, সেখানে এই কলেজটিতে আছেন ৩৫ জন ছাত্র পিছু ১ জন। এবং কমার্সিয়াল আর্ট ও স্কাল্পচার ডিপার্টমেন্টে আছেন মাত্র ১ জন করে শিক্ষক।

এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই ছাত্ররা দীর্ঘদিন ধরে এ মন্ত্রী সে মন্ত্রীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রাস্তায় ঘাটে চলেছেন মিছিল করে। গত ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩, এই এক বছরে ভারতের বিভিন্ন ভাষার সংবাদ পত্রে মোট ৯৮ বার এই আর্ট কলেজের অব্যবস্হা এবং আন্দোলন নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় ছাত্ররা তাদের দাবির সমর্থনে একটি সিটিজেনস কমিটি গঠন করে

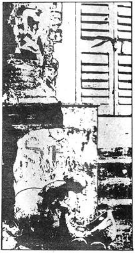

আর্টকলেজের ভগ্নাবশেষ

মোট ৫০,০০০ ব্যক্তির সাক্ষর সংগ্রহ করেন। সাক্ষরকারিদের দীর্ঘ তালিকায় প্রথম সাক্ষরকারি ছিলেন সত্যজিৎ রায়। এরপর ছাত্ররা যখন এই তালিকা হাতে তাদের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করলেন, সত্যজিৎ-এর সাক্ষর দেখে মুখ্যমন্ত্রী মস্করা করে বলেছিলেন, 'তোমরা তো ভাল জায়গায় গুঁতো দিয়েছ, এরপরে তো কিছু করতেই হয় দেখছি --'! এই মস্করা আজও সমানে চলছে। □

শুভাশিস মৈত্র

অন্নদা মুন্সী স্মরণে

দুর্গারতন দত্ত

১৯৫৫ সাল। আমি তখন নদীয়া জেলার ফুলিয়াতে থাকি। ওখানকার পলিটেকনিকে কমারশিয়াল আর্ট বিভাগে এক বছরের একটা ট্রেনিং নিচ্ছি। একদিন আমার বন্ধু শ্রী চাকী জানালেন তাঁর মেসোমশায় শ্রী অন্নদা মুন্সী এখন ফুলিয়াতে তাঁদের বাড়ী আছেন। বেশী দিন থাকবেন না। কাল পরশু নাগাদ চলে যাবেন। আমি তাঁকে দর্শন করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। তৎক্ষণাৎ চাকীর সংেগ তার বাড়ি ছুটলাম। পথে যেতে যেতে মনে নানা রকম প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। অত বড় মানুষ আমার সংেগ দেখা করবেন তো? চাকীকে একসময় জিজ্ঞাসা করলাম "আমার সংেগ দেখা করবেন তো"? সটান উত্তর পেলাম – "তুই জানিস না, তিনি অন্য এক জগতের লোক"। ওদের বাড়ির কাছে আসতেই চাকী দেখালো দেখছিস, "উনি এক মনে বাগানে বসে ছবি আঁকছেন।" ওঁকে দূর থেকে দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পরে ওঁর কাছে ভীরু পায়ে এসে দাঁড়ালাম। চাকী আমার নাম বলে আগমনের কথা জানাতেই উনি মুখ না ঘুরিয়েই প্রশ্ন করলেন "কি নাম, দুর্গা? আমি তো অন্নদা, আবার আমার কাছে স্বশরীরে স্বয়ং দুর্গা এসে হাজির। তাহলে তো দারুন জমবে! কি বলো দুর্গা? বোস এই খানে বোস।" কত অল্প সময়ে আমাকে আপন করে নিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে বসে তুলির টান, রংয়ের খেলা দেখতে লাগলাম। খুব আন্তরিক সুরে আমার খবরা খবর একে একে জানতে চাইলেন। কি করি, কোথায় থাকি ইত্যাদি। যখন জানলেন আমি কমারশিয়াল আর্টের শিক্ষা নিচ্ছি, তারপর আর্ট কলেজে আরো শিক্ষা নেব তখন বলে উঠলেন "আরে শিয়ালের শিক্ষা নিয়ে কি হবে? ওটা পরে নিলেও চলবে। প্রথমে ফাইন আর্টের শিক্ষা

নাও। ওইটা হচ্ছে আসল।" আমি কিছু সময় থেকে পায়ের ধুলো নিয়ে চলে আসবার উপক্রম করতে বলে উঠলেন "ও ধুলো-টুলো মাথায় নিয়ে কিছু হবে না, আসল জিনিস মাথায় নিয়ে আর্ট কলেজ থেকে বেরোতে পারলে তবে বুঝব! ঠিক আছে কাল বিকালের দিকে এসো, আমি হয়তো কালই চলে যাব।"

পরের দিন যথা সময়ে দেখা করতে গেলে আমায় বললেন "আর একটু দেরি হলে দেখা হত না। বন্ধু চাকীকে বললেন দুর্গার জিনিসগুলো দুর্গাকে দিয়ে দাও।" জিনিসগুলো পেয়ে আনন্দে আমার চোখে জল এসে যাবার অবস্থা। যখন এগুলো আঁকছিলেন তখন মনে মনে এর দু'একটা পাবার ইচ্ছা হয়েছিল। জানিনা আমার মনের কথা কিভাবে জানলেন?

ফুলিয়াতে থাকার সময় কয়েকটা নাম করা ছবি উনি এঁকেছিলেন। যার কয়েকটা আজ আমার কাছে আছে। ১৯৭৯ সালে শিলিগুড়িতে আমার কোয়ার্টারে যখন ছিলেন, সেই সময় ওঁর মুখে বলা জীবনের ঘটনাবলীর কথা আমার টেপে ধরে রেখেছিলাম। তার থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু অংশ এখানে দিলাম।

১৯২৫ সালে কলকাতায় সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বর্তমানে যার নাম সরকারী চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয়। এখানে দু বছর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। চার্ট, ব্ল্যাক বোর্ডে ফ্রিহ্যান্ড ড্রইংয়ে শিক্ষকদের কাছে বেশ সুনাম অর্জন করেন। বাঁধা ধরা নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে শিল্প শিক্ষা করা তাঁর কাছে ভালো লাগল না। তাই তিনি আর্টস স্কুল ছেড়ে দিয়ে যশোহরে তাঁর স্বগ্রামে ফিরে গেলেন। তাঁর পিতা অনুকূল চন্দ্র মুন্সী সেই সময়কার একজন সুপ্রসিদ্ধ স্বভাব-শিল্পী ছিলেন। তাঁর ঝিনুকের উপর খোদাই করা দেব দেবীর ও মানুষের মূর্তির কাজ বিখ্যাত ছিল। এখনও কোথাও কোথাও সেই কীর্তির কিছু কিছু স্বাক্ষর দেখা যায়। অন্নদা মুন্সী তাঁর পিতার কাছে প্রথম জীবনে কিছুদিন ছবি আঁকা শিক্ষা করেন। অল্প বয়সে স্নেহময়ী মাকে হারান। তাই ঘরে মা না থাকায় তাঁর মন টেকেনা। তিনি পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন এবং তাঁর এক নামকরা বিপ্লবী বন্ধুর বাড়ী ওঠেন। তাঁদের প্রভাবে অন্নদা বিপ্লবীর সঙ্গে ভারত উদ্ধারে মেতে উঠলেন এবং নিজেই একটি গানের দল গড়ে গান গেয়ে পয়সা সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের আর্থিক সাহায্য করতেন; আর সেই সঙ্গে চলে তাঁর শিল্পচর্চা। এই সময় শ্রী মুন্সী সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞাপন শিল্পে

KARUKARJO
OR INDIAN HANDICRAFTS

48 TALA PARK AVENUE CALCUTTA 700037 INDIA

স্নেহের [illegible],

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি শিলিগুড়িতে ছিলাম। হঠাৎ এক পূর্ণিমার রাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা কে [illegible] ওপরেই। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম, সে রাতের মন ভোলানো [illegible] পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাবোনা। মনস্থির করে ফেললাম, এই দেশ ছেড়ে কোথায়ও যাবোনা! শিলিগুড়ি নীচে রেখে উঠে গেলাম কার্শিয়াংএ। সেখানে কয়েক মাস থাকলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আরও কাছে পেলাম, কিন্তু পূর্ণিমার রাতে শিলিগুড়ি থেকে যে দৃশ্য দেখেছি, তা আর মন থেকে গেলোনা! এখনো মাঝে মাঝে মনের ভিডিওটেপরেকর্ডারে সেই ছবি দেখতে পাই। তোমার চিঠি পেয়ে মনটা আবার শিলিগুড়িতেই ছুটে গেল। তোমার ওখানেই উঠবো, ছবি আঁকতে দেবে তো?

তবে [illegible] মাসটা কেটে যাওয়াই ভালো। ফেব্রুয়ারি মাসে চেষ্টা করবো, [illegible] করে ট্রেনেই যাবো, স্টেশনে চিনতে পারবে ঠিকই। বেঁটে খুঁটে লোকটা, সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরা, হাতে একটা ছোট্ট স্যুটকেশ, মাথার চুলটা সাদা হয়ে আসছে, তিয়াত্তরে পড়েছি, তবে মনটা ও কার্যক্ষমতা কোনও যুবার সাথে পাল্লা দিয়ে এখনও প্রথম পুরস্কার লাভ করতে পারে। ছবিও আঁকছি, বইও লিখছি, তবে শিলং যাওয়াটা বোধ হয় হলোনা কারণ খাসিয়া বিদ্রোহ। দার্জিলিংএও শুনছি গোর্খা লিগ রাজভবনও দখল করে নেবে। যাই হোক, আমি আসছি, সঙ্গে হয়তো আমার ছেলে অথবা মা কুমকুম থাকবে। কুমকুম আমাদের চেয়ে বড় আর্টিস্ট হয়ে পড়েছে। ওর কাজের তুলনা হয়না পৃথিবীতে।

যাবার দিন স্থির হয়ে গেলে টেলিগ্রাম করবো। এখানে এখনও আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে আছি। কাজের আর শেষ হয়না! তুমিও যদি কোন কারণে দু'এক দিনের জন্য কোলকাতা আসতে পারো, এসো, কুমকুমের ছবি দেখে আনন্দ পাবে। আমার পুরো 'কমার্শিয়াল' হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন সৃষ্টির কাজে কুমকুমই অসামান্য। আমি এখন সম্পূর্ণভাবে বাইবেল এর কাজে আত্মনিয়োগ করেছি, মাঝে মাঝে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র আঁকছি, আঃ কী বলবো তোমায়, এ কাজের তুলনা নেই! মনটাও খুব ভালো থাকে।

তোমরা সবাই কুশলে আছো। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। [illegible] ইতি

তোমার কাকাবাবু
অন্নদা মুন্সী

টাইপোগ্রাফ সোকার্ড ও হস্তাক্ষরের একটা পরীক্ষা দেন। এবং ১০০ জনের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। বোম্বাইয়ে টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান তাঁকে ঐ শাখার কাজে নিযুক্ত করেন। এই সময় বম্বের বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলা গান তিনি ও তাঁর বন্ধু বিজয় গোস্বামী প্রথম প্রচার করেন। এবং যতদিন বম্বেতে ছিলেন নিয়মিত বাংলা গানের শিল্পী হিসাবে বেতারে গান গেয়েছিলেন।

১৯৩৬ খৃঃ লণ্ডনের ডি. জে. কীমার এণ্ড কোং কলকাতায় একটা নতুন শাখা অফিস খোলেন। সেই অফিসের অধিকর্তা শ্রী মুন্সীর মেধাযুক্ত কাজ দেখে তাঁকে বিজ্ঞাপন বিভাগে চাকুরী দিয়ে নিয়ে আসেন। এরপর এই বিভাগের প্রধান শিল্পী হিসাবে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। বিজ্ঞাপন শিল্পে বাংলা ইংরাজীর মাধ্যমে এক আধুনিক ভারতীয় ভাব ধারার সৃষ্টি করেন। ১৯৩৭ খৃঃ ভারতীয় রেলপথের জন্য কয়েকখানা অনবদ্য বিজ্ঞাপন শিল্প সৃষ্টি করে তিনি ভারত বিখ্যাত হন এবং তাঁর নাম ভারতের সীমানা পেরিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভিশুয়াল আর্টিস্ট, লেআউট আর্টিস্ট রূপে সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪২ খৃঃ এইখানে আজকের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রী সত্যজিৎ রায় মহাশয় শান্তিনিকেতনের শিল্প শিক্ষা সমাপ্ত করে শ্রী মুন্সীর কাছে থেকে ভিশুয়াল আর্টের নানা কলা কৌশল শিক্ষা করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি ডি. জে. কীমারের স্টুডিওর ভার তাঁর উপযুক্ত সহকর্মী শিষ্য ও বন্ধু সত্যজিৎ রায়ের হাতে অর্পণ করে কাজ থেকে বিদায় নেন। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, বিভক্ত-বাংলা দুর্ভিক্ষ ও শরণার্থীর স্রোতে দেশকে ভেসে যেতে দেখে অত্যন্ত মানসিক পীড়ায় তিনি ভগ্নহৃদয়ে কার্শিয়াং পাহাড়ে নির্জনে আপন মনে শুধু নতুন নতুন শিল্প

সৃষ্টির কাজের মধ্যে ডুবে থেকে মনের ভারসাম্য বজায় রাখেন। কিন্তু জীবনের ধারা তখন স্তব্ধ হয়নি। পাবলিসিটি ফোরামের মালিকের পুনঃপুনঃ অনুরোধে বিজ্ঞাপন শিল্পের কাজে আবার ফিরে এলেন এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এখানে আর্ট ডিরেকটরের পদ অলংকৃত করেন।

বর্তমানের বহু নামকরা শিল্পীকে বিজ্ঞাপন শিল্পে তালিম দিয়ে দক্ষ অভিজ্ঞ করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর মধ্যে সর্বশ্রী ও. সি. গাঙ্গুলী, মাখন দত্তগুপ্ত, রনেন আয়ন দত্ত, রঘু গোস্বামী, ও সমর ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহু নামী অনামী শিল্পী তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর কর্মময় জীবনকে একটা বিশেষ প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে দেখা যাবে তিনি কেবল একজন শিল্পীই ছিলেন না আপন ভোলা দরদী মানুষও ছিলেন।

নিরহংকার, নির্লোভ, অল্পে তুষ্ট মানুষটি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন কি করে মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করা যায়। মনে হয় তিনি কেবল দিতেই এসেছিলেন।

চিত্র শিল্প ছাড়া আরো অনেক বিষয়ে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্রে অসাধারণ যোগ্যতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। এর মধ্যে বেহালার হাত ছিল তাঁর বিস্ময়কর। উচ্চাঙ্গ ও পাশ্চাত্য সংগীতের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে-ছিলেন। বর্তমানে সমাজ ও সমাজপতিদের উদ্দেশে চাবুক মারা বই "ক্রুসবিদ্ধ ভারত" পড়লে বোঝা যায়, ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখার হাত কত উঁচু স্তরের।

জীবনের সায়াহ্নে গীতা ও বাইবেলের অনুশাসন অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক শিল্প জগতে প্রবেশ করে এক নতুন শিল্প ধারা সৃষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনের কাজ ও কথাবার্তা সাধারণভাবে কিছুটা অস্বাভাবিক, কিছু অপ্রকৃতিস্থ মনে হতো হয়তো। বস্তুতপক্ষে অন্নদা মুন্সী ছিলেন ভিন্ন জগতের মানুষ, তাঁর মনন জগতের বিচরণক্ষেত্র ছিল সাধারণ মানুষের অগম্য।

এরকম মহৎ প্রাণ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। যে সুদক্ষ তুলির টানে, রঙের খেলা সকলকে বিমোহিত করত যে দক্ষ বাজিয়ের হাতে একদা বেহালার সুরের মূর্চ্ছনা সকলকে বিস্মিত করত মোহিত করত সেই বেহালার ছড় আর সেই তুলি আজ স্তব্ধ, নিশ্চুপ। □

অন্নদা মুন্সির রোজনামচা

আর্ট কলেজের ছাত্র। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের কাছে একটা মেসে থাকি। নিত্যই প্রায় অন্নদা কাকাবাবুর বাড়িতে যাই।

একদিন সকালে দেখলাম উনি পিয়ানো বাজাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, বস দুর্গা। ওয়েসটার্ন আর বাংলা ক্লাসিক সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছি, শোন। উনি বাজিয়ে যেতে লাগলেন। আমি বসে রইলাম।

একটু পরে দুজন মহিলাকে দেখা গেল দরজার কাছে। দেখে মনে হল অভিজাত বাড়ির বৌ। আমাকে ইশারায় বললেন, বাধা দেবেন না। কাকাবাবু আমার দিকে তাকালেন। তারপর ওঁদের দেখে বললেন, কি চাই ? টুল থেকে নেমে এলেন। বললেন, বসুন। নিজে তাঁর বাঘছাল আসনে বসলেন। বললেন, কি ব্যাপার ? ওঁদের একজন বললেন, মুন্সিদা, বছরে একটা ম্যাগাজিন বার করি। আপনাকে কভারটা করে দিতে হবে। কাকাবাবুর সহজ জবাবঃ ও, এই ব্যাপার ? বসুন। এক্ষুনি করে দিচ্ছি।

কাগজ নিলেন। হাতে তুলি, নাকে নস্যি। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পেনসিল দিয়ে কিছু আঁকলেন। সেই ড্রয়িংএর উপর সল্যুসন টিউবটা ঘুরিয়ে নিলেন। পাশে ওঁর প্যালেটে ফুজি রং–এর কয়েকটা কাগজের টুকরো নিজে জল দিয়ে শিস দিতে দিতে কাগজের উপর বোলাতে লাগলেন। এই সময় কাকিমা এসে একবার ডেকে গেলেন। শুনতেই পেলেন না। একটু পরে বললেন, আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করুন, হয়ে গেছে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে সল্যুসনটা তুলে কয়েকটা জায়গায় তুলির টান দিলেন। ডাইরেক্ট ব্রুশ দিয়ে পত্রিকার নাম লিখলেন। তারপর বললেন, এই নিন।

ওঁরা ভীষণ খুশি। বললেন, আমরা কিন্তু মূল্য দিতে পারছি না। কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে। ভদ্রমহিলা বসে রইলেন। একটু পরে বললেন, আপনার পিয়ানো বাজনা বেশ ভালো লাগছিল। আমারও শেখার খুব ইচ্ছে। কর্তাকে বলেছিলাম। তিনি কিছুতেই আনছেন না। বলছেন, ওটা নাকি বিলাসিতা। ওসব শিখে কি হবে ?

কাকাবাবু কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু উঠে পড়লেন। বাড়ির সামনের ব্যালকনিতে গিয়ে নিচের দিকে চাইতে লাগলেন। ফিরে এসেই বাড়ির ভিতরে গেলেন। দেখা গেল বড় ছেলে আবির বাড়ি ফিরছে। তাকে বললেন, নিচে থেকে একটা কুলি ডেকে আন। আবির দিরুক্তি না করে নিচে নেমে গেল। একটু পরেই একটা লোককে সংগে নিয়ে এল। আমি হতভম্ব। ভদ্রমহিলাও। কাকাবাবু বললেন, এ সমান নিচে লে সকতা ? পিয়ানোটা খুব বড় নয়। কুলি বললে, হা বাবু, লে জায়গা। কাকাবাবু নিজেই একদিকে ধরে পিয়ানোটা নিচে নামাতে লাগলেন। বললেন, দুর্গা, বস। আসছি। খালি পা, গায়ে গেনজি। নিচে নেমে ভদ্রমহিলাদের গাড়ির বুট খুলে পিয়ানোটা সেখানে সযত্নে রেখে দিলেন। পায়াগুলো খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, ওটা সত্যি আমাকে দিলেন ? কাকাবাবুঃ হাঁ। আপনি শিখতে পারছেন না, তা কি কখনও হয় ? ভদ্রমহিলাঃ কত দিতে হবে ? কাকাবাবুঃ ওসব ঠিক আছে। আপনি এটা নিন, আমি আর একটা কিনে নেব।

একদিন সন্ধ্যায় এসেই দেখলাম আমজাদ আলি সেতার বাজাচ্ছেন। কাকাবাবু তবলায় সংগত করছেন। হীরু গাংগুলীও ওখানে ছিলেন। বাজনা শেষ হতে মনে হল হীরু গাংগুলী হতভম্ব হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, পেটে পেটে এত বিদ্যে তোমার ? আমাদের ভাত মারবে মনে হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, না, না। তুমি অসুস্থ, তাই ঠেকা দিলাম।

* *

পাড়ার একটি ক্লাবের ছেলেরা এসেছে। তারা একটা ব্যাণ্ড পার্টি গড়বে। ব্যাণ্ড প্রভৃতি কিনতে হবে। অনেকেই পাঁচ টাকা অবধি দিয়েছেন। মুন্সিদা কিছু দিন।

গ্যাটি থেকে ভাঁজ করা একশত টাকার একটা নোট বার করে ছেলেদের দিলেন। তারা হতবাক। কিছু বুঝতে পারছেন না। কাকাবাবুঃ কি, ওতে হবে না ? একটি ছেলে

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে: যা দেবী সর্বভূতেষু দয়া রূপেন সংস্থিতা। নমোস্তস্যৈ নমোস্তস্যৈ নমোস্তস্যৈ নমো নমঃ। দয়া, মায়া, বৃত্তি, জাতি, লজ্জা এসব দেবীরই গুণ, দোষ নয়। ঠাকুর যদি জীবে দয়া, পরোপকার কে উড়িয়ে দেন, বলবার কিছু নেই। তিনি বলতেন, মানুষের কী ক্ষমতা আছে যে সে দয়া পরোপকার করবে! ক্ষমতা তো দেবীর, এই কথাই তিনি বলেছেন। জয়ন্তর দিদি এসেছিলেন, দেখে গেছেন। জয়ন্তর আসবার কথা আছে। দেখা যাক দেবীর কি ইচ্ছা। সর্বাঙ্গীন তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। ইতি।

শ্রীঅন্নদামুন্সী

শ্রীদুর্গারত্ন দত্ত,
A-1/4 Government Housing Estate | মিলন পল্লী
P.O. SILIGURI
Dt. Darjeeling
পিন PIN

বললন: এতে তো সবই হয়ে যাবে। আনন্দ করতে করতে ওরা চলে গেল।

কিন্তু কাকিমা চটে গেলেন। সংসারে প্রচন্ড টানাটানি চলছে। বললেন, ও বেলা চলবে কি করে? কাকাবাবু দু হাত তুলে বললেন, যীশু সবকিছু চালিয়ে দেবেন।

অদ্ভুত ব্যাপার। ঘন্টা খানেক বাদে একজন ভদ্রলোক এলেন। বললেন, আপনাকে একটা লে-আউট করতে হবে। এক রকম জোর করেই তিনি দুশ টাকা অ্যাডভান্স দিলেন। জানতে চাইলেন, কবে আসব? কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, কাল আসুন।

পরে আমাকে বললেন, দেখলে যীশু দেখেন কি না। বিশ্বাস রাখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়ির ব্যালকনিতে ছোট একটা বাগান করেছিলেন। রকমারি ফুলের গাছ টবের উপর বসানো। মুন্সিবাগানে পাখি আর কাঠবিড়ালির ভিড়। কাকাবাবু তাদের দেখে শিস দিতেন, খেলতেন। একদিন দেখি অচিন্ত্য সেনগুপ্তর সঙ্গে গল্প করছেন। বললেন, চিনতে পার? পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, প্রণাম কর। ওঁকে দেখে মনে হল চিন্তিত। অস্থির ভাবে ঘর-বাইরে করছেন। জানতে চাইলাম, কিছু হয়েছে কি?

বললেন, আজ নিমাই আসবেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু। কিছু পরেই দেখি ছবি বিশ্বাস আর পাহাড়ী সান্যাল আসছেন। ওঁকে দেখে ছবি বিশ্বাস বললেন, কি মুন্সিদা, এখনও রেডি হন নি। কাকাবাবুঃ আমি সব সময়ে রেডি। বাড়ির ভিতরে গিয়েই বেরিয়ে এলেন। স্বগলে 'বেহালা', গায়ে পাঞ্জাবি। পাহাড়ি সান্যালঃ কি শুধু ভায়োলিন হলেই চলবে? ডুগি তবলা কোথায়? ছবি বিশ্বাসঃ পথে পান্নাকে (ভট্টাচার্য) তুলে নেব। তার কাছে হারমোনিয়াম আর ডুগি তবলা পাওয়া যাবে। কাকাবাবুঃ রামপ্রসাদও আসছেন। বা: বা:।

স্নেহের দুর্গারত্ন,
তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যথাসময়ে পৌঁছেছি কিন্তু মনটা শিলিগুড়িতেই ফেলে এলাম যেন। তোমাদের সকলের অকৃত্রিম আত্মীয়তার ভারে আমরা গর্বিত। তোমরা এখানে এলে খুশী হবো। ফটো পাঠাচ্ছি। শরীর ভালো আছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। খুব ভালো খবর। সকলকে প্রণাম।
তোমাদের
অন্নদামুন্সী

টালা পার্কে একটা নামকরা যাত্রা দল এসেছে। সালটা সম্ভবত ১৯৫৯। দ্বিতীয় দিনে জানা গেল দলের বেহালাবাদক অসুস্থ। বিপন্ন দলনায়ককে একজন দর্শক কাকাবাবুর বাড়ি দেখিয়ে বললেন, ওখানে একজন আর্টিস্ট থাকেন। ওঁর কাছে যান, মুশকিল আসান হতে পারে। ভদ্রলোক সব বলতে কাকাবাবু বললেন, কাল আপনাদের পালা দেখেছি। বেশ ভাল হয়েছে। সকালে বিবেকের গানটা বেহালায় তুলছিলাম। ঠিক আছে, আমি বাজাব। ভদ্রলোক বললেন, অনেক ধন্যবাদ। আমি এসে নিয়ে যাব। কাকাবাবুঃ না, কিছু করতে হবে না। আমি নিজেই যাব।

পরের দিন এসে জানতে পারলাম, কাকাবাবু বিবেকের গানে তো বটেই, অন্য সময়েও যেমন দরকার বাজিয়ে ছিলেন। দলের ম্যানেজার ওঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলেন। কাকাবাবু কিছু না নিয়ে বলেছিলেন, কাল সকালে আমার বাড়িতে আসবেন। কাকাবাবু টাকাটা হাতে না নিয়ে বাইরে একজন ভিখিরিকে দেখিয়ে বললেন, ওকে দিন। ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাকাবাবু আবার বললেন, কই, ওকে দিন। ওকে দিলেই আমাকে দেওয়া হবে। ভদ্রলোক চুপ করে বসে রইলেন। কাকাবাবু নিজে গিয়ে টাকাটা নিয়ে ভিখিরিকে দিলেন। ভদ্রলোক বললেন, ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। □

বাঙালীর উৎসবের চৌদ্দ-পার্বণ বইমেলার প্রেক্ষাপট

পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

বাঙালীর জীবন প্রবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবাদই চালু আছে "বারো মাসে তেরো পার্বণ'। ১লা বৈশাখ গণেশ পূজো দিয়ে শুরু আর শেষ হয় মাঘ মাসে সরস্বতী পূজোতে। শেষ হতে না হতেই তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় 'কলিকাতা পুস্তক মেলা'র। উৎসবের ফর্দে গত দশ বছর ধরে আর একটি নাম সংযোজন হয়েছে। এর উদ্যোক্তা 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড'।

এই বইমেলার সূত্রপাত ১৯৭৫ সালে। মাত্র তিরিশজনকে নিয়ে যে বইমেলার যাত্রা শুরু ১৯৮৫তে বৃদ্ধি পেয়ে ২২১ জনে দাঁড়িয়েছে। অবাশ গত বছর ৪৫০ জনের মত প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সব দিক থেকেই গত বছর বইমেলা ছিল বৃহৎ। আয়তন, আয়োজন এবং অংশগ্রহণে। বইমেলার সময়সীমা গতবারকে বাদ দিলে ১০ থেকে ১২ দিনের মত হয়। গতবার চলেছিল ১৭ দিন ধরে। প্রথম দিকে ছিল কলকাতা ভিত্তিক প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীব্যাপি পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকেরা বই-এর সম্ভার নিয়ে সাজিয়ে বসেন কলিকাতা পুস্তক মেলাতে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইমেলা বসে ফ্রাঙ্কফুর্টে। দিল্লীতে প্রত্যেক দুবছর অন্তর প্রগতি ময়দানে বসে 'ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার'। এই রকম প্রাণচঞ্চল বইমেলা বোধ হয় মেলা ভার। দশভাগ ত্রুটি বিচ্যুতি বাদ দিলে নব্বইভাগ সফলতার দাবীদার উদ্যোক্তরা। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে কিছু ভুল ত্রুটি তো হতেই পারে। মোটের উপর তারা তো মানুষ।

প্রথমে ভুলত্রুটির উপর কিছুটা আলোক-পাত করা যাক। প্রশংসাটা পাওনা রইল। যেমন প্রত্যেকবারই যাঁরা অংশগ্রহণ করেন পুস্তক বিক্রেতা বা প্রকাশকেরা (ছোট) তাঁদের অধিকাংশেরই মনোভাব যে, তাঁদেরকে সুবিধেমত জায়গা দেওয়া হয়নি। ক্যাথিড্রাল চার্চের দিকে একটা গেট এবং রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে আর একটা গেট। অতএব প্রধান গেটের দিকে যারা পাবেন তাঁরা হয়ত বেশি ক্রেতাকে পেতেন। অভিযোগটা বেশি আসে মাঠের মাঝখানে যাঁরা স্টল পান। বা যারা টয়লেট এবংকোনও খাবারের স্টলের পাশে পান। অভিযোগটা আরও বেশি আসে লিটল ম্যাগাজিনের পাশে যদি কারো স্টল পড়ে। উদীয়মান লেখক, কবি, শিল্পীরা তাঁদের নাম মাহাত্ম্য প্রচারে ক্রেতাকে আকর্ষণ করার জন্য চেঁচামেচি, অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেন দর্শকরা পারতপক্ষে সেই জায়গা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পার্শ্ববর্তী স্টল হোল্ডারা। লিটল ম্যাগাজিন স্টলগুলোরসঙ্গে কল-কাতার শেয়ার মার্কেটের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। এর সম্পূর্ণ দায়টা গিয়ে পড়ে উদ্যোক্তাদের উপর।

এই স্টল ভাগ করা হয় নাকি লটারির মাধ্যমে। তাও অবশ্য সব স্টল নয়। লটারি হয় প্রধানত ১০০, ২০০ এবং ৪০০ বর্গ ফুটের স্টল গুলোতে। ১০০০ বা ২০০০ ফিটের গুলোতে অবশ্যই নয়। সেগুলোর বিলি ব্যবস্থা 'ফার্স্ট' কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে'। অবশ্য সংখ্যায় ও তারা বেশি নয় তিন থেকে চার।

প্রত্যেকবারই একই অভিযোগ শোনা যায় স্টল হোল্ডারদের কাছ থেকে 'আমাদের এদিকটায় একদমই লোক আসছে না। আমরা বিক্রি চাইছি না অন্তত লোক এসে বই দেখুক কিন্তু সেটাও হচ্ছে না'। এইরকম হওয়ার কারণ মাঝখানে যে ফোয়ারা, মিটিং পয়েন্ট বা কিওস্ক করা হয় সেগুলো এমন ভাবে করা হয় মাঝবরাবর, যার ফলে লোক আকর্ষণ করে ডানদিক গুলোকে, বাঁদিক-গুলো যে কারণে কানা হয়ে পড়ে।

প্রধান অভিযোগ আসে যাঁদের স্টলের পাশে প্রস্রাবাগার থাকে। প্রথমত, দর্শক সংখ্যা খুবই এবং দুর্গন্ধে তাদের নাভিশ্বাস ওঠে। বহু অনুরোধ উপরোধেও কোনও কাজ

হয়না। গিল্ডের অফিসে এ সম্বন্ধে অভিযোগ করলে তাঁদের কাছ থেকে 'দেখছি দেখবো' ছাড়া আর কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না। কেননা করণীয় তাঁদেরও কিছু নেই।

করণীয় ত্রুটিগুলোর মধ্যে প্রথম, লক্ষ মানুষের পদচারণায় যে ধুলিঝড় ওঠে তা নিশ্চয়ই বন্ধ করা যায়। কেননা ফায়ার ব্রিগেডের দুখানা গাড়ি যখন সব সময় মজুত থাকে। হোসপাইপের সাহায্যে সেই ধুলিঝড়ের হাত থেকে কিছুটা নিশ্চয়ই নিস্তার পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকই অসুস্থ হয়ে পড়ে এই ধুলোর আক্রমণে। এটুকু বোধহয় এড়ানো যায়।

দ্বিতীয়ত, সরকারের কাছে নাম মাত্র টাকায় মাঠটাকে ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেক স্টল হোল্ডারের কাছ থেকে প্রত্যেক বর্গফুটের ভাড়া ধার্য করা হয়েছে ৭.৫০ টাকা। এবার স্টলের সংখ্যা ২২১টি (এর মধ্যে কিঅস্ক্স, রেস্টুরেন্ট এবং ইন্ডিয়ান কফি হাউস বাদ)। যার মোটামুটি হিসাব ২৮৫০০০ বর্গফুট এলাকা। প্রত্যেক বর্গফুটের দাম ৭.৫০ টাকা করে ধরলে দাঁড়ায় ২,১৩,৭৫০ টাকা। টেবল স্পেস ৪৮টি। যার প্রত্যেকটি টেবল পিছু ১২৫ টাকা অতএব মোট ৬০০০ টাকা। এর বিনিময়ে স্টল হোল্ডাররা পান তিন পাশ টিন দিয়ে ঘেরা ও মাথার ওপর ত্রিপল ও দুটি ফ্লুরোসেন্ট বাতি দুটি চেয়ার। এর বাইরে সব কিছুরই আলাদা খরচা বহন করতে হয়, যেমন গ্রীলের দরজা, ডেকরেশন, (যার যেরকম সাধ্য। তারও চার্জ পনের টাকা প্রতি বর্গফুটে) এক্সট্রা লাইট প্রভৃতি। এছাড়াও আছে ৫০ টাকা ট্রেড লাইসেন্স ফি বা বিভিন্ন ধরণের বীমার খরচ। গত বছর না কি ১০০ ব. ফ. দাম ধরা হয়েছিল ৮৫০ টাকা এবার তা ১০০ টাকা কম রাখা হয়েছে! 'রেট' সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে। '৭৫-এ প্রত্যেক বর্গফুটের দাম ছিল ৪ টাকা '৮৫-তে সেটাই দাঁড়িয়েছে ৭.৫০ টাকাতে, প্রায় দ্বিগুণ।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশকেরা''কাটতি লেখকদের' নতুন বই প্রকাশ করে এবং গিল্ডের প্রচার অফিস মারফৎ প্রচার করা হয় আজ 'অমুক পাবলিশার্সের ঘর থেকে অমুক লেখকের বই তাঁর সুহস্তে স্বাক্ষর মারফৎ অল্প কিছু সংখ্যক বই পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। যাঁরা বই সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তাঁরা অমুক স্টলে চলে যান।' এর ফল স্বরূপ তার পার্শ্ববর্তী স্টলগুলোর নাভিশ্বাস ওঠবার জোগাড় কেননা তাদের গেট আটকে দীর্ঘ লাইন চলে যায়। বাদ বাকীটা পাঠক নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন। এ জিনিস যদি বেশিদিন চলতে থাকে তবে বই এবং কাঁচা-আনাজের দোকানদারীর পার্থক্যটা কমে আসতে দেরি হবে না।

এরপর ধরা যাক ক্রেতাদের ক্ষোভের কারণগুলো। সারা বছর ধরে কলেজস্ট্রীট পাড়ার বই-এর দোকানে যে পরিমাণ ছাড় পাওয়া যায় তার থেকে অনেক কম ছাড় পাওয়া যায় বইমেলাতে। মাত্র ১০ শতাংশ। এই পরিমাণ ছাড় একমাত্র প্রযোজ্য লাইব্রেরীগুলোর ক্ষেত্রে। বা বিদেশী প্রকাশক যাঁরা অংশ নেন তাঁদের ক্ষেত্রে। যে বই আমরা সাধারণত দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারিনা সেগুলো মেলার থেকে বাধ্য হই সংগ্রহ করতে বা দুষ্প্রাপ্য কিছু রচনা। কিন্তু সারা বছর ধরে ক্রেতারাই পাড়ায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশে যেখানে সংগ্রহ করতে পারে সেখানে ১০ শতাংশ দিয়ে কেউই বইমেলায় কিনবেন না। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারা? প্রকাশক না ক্রেতা? একই দাবী উভয় পক্ষই রাখছেন গত কয়েকবছর ধরে। গিল্ডের বক্তব্য, যাদের যে বই প্রয়োজন তাঁরা ঠিকই কিনবেন। সেখানে ছাড় কমলো কি কমলো না তারজন্য কিছু যায় আসে না।

অবশ্য কিছু প্রকাশক আইন বাঁচিয়ে ছাড়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। যেমন 'বইমেলা উপলক্ষে ৮০ টাকার বই ৫০ টাকায়' এই কদিনের জন্য। এইভাবেই দুষিত হয়ে চলেছে বইমেলার আবহাওয়া। এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে প্রকাশকদের মধ্যে।

এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে ছিল ইউ কে ইউ এস এ ইউ এস এস আর বাংলাদেশ এবং জেনেভা। দেশের অন্যান্য প্রান্তের মধ্যে দিল্লির থেকে এসেছিল ২৩জন, তাঙ্কড়া তামিলনাড়ু, অমৃতসর, আমেদাবাদ, গুজরাট এবং বারাণসী। ২২১টি প্রকাশন সংস্থার মধ্যে ৬টি ছিল বিদেশি, বাকি ২১৫টি ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের। অবশ্য তার সিংহভাগটাই ছিল কলকাতার।

বই-এর এই বিপুল সম্ভারেছিল সমস্ত ধরণের বই। যার মূল্য ১ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। আমেদাবাদের একটি অ্যান্টিকুয়োরিয়ান সংস্থা 'লাস হিন্দুস' - সলভিন্স, প্রকাশকাল ১৮০২, সংখ্যা ১-৪, যার মূল্য এক লক্ষ টাকা। এবং এক টাকায় পাওয়া যাচ্ছে 'খাই খাই' বা ৫০ পয়সায় 'ভূতোস্কোপ'।

বই মেলায় বিক্রিত বইয়ের মধ্যে অধিকাংশই বাংলা তার মধ্যে বিশেষ করে উপন্যাসেরই চাহিদা বেশি। ছোটদের বইও কম নয়। অধিক বিক্রিত বইয়ের মূল্য ২ থেকে ৫ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অল্প পয়সায় বেশি বই পাওয়া যায় অবশ্য রাশিয়ান। চাইনিজ বইয়ের (বাংলা সংস্করণ) দামও ঐ একই রকম। ১২-১৪ টাকায় বেশ অনেকটা পরিমাণই বই পাওয়া যায়। তুলনায় ইংরাজি বইয়ের কাটতি কম।

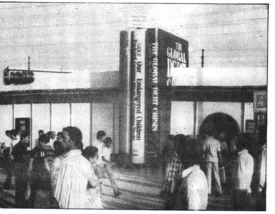

রেফারেন্স, হিস্ট্রি, সোসিওলজি প্রভৃতি বইয়ের কাটতি আরও কম। ভাল বাজার পায় টেক্সট বুক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি। তবে সব চাইতে ভালো বাজার পায় যার ঘরে অভিধান আছে। কাটতি বইয়ের মধ্যে সেরা। অবশ্য রচনাবলীর বাজারও খারাপ নয়। অধিকাংশেরই মনোবৃত্তি রচনাবলীর প্রতি। যা ঘরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

এবারের বইমেলার একটি আকর্ষণ ছিল সাহিত্যিক, লেখকদের স্মৃতিচারণা। এতে অংশ নিয়েছিলেন সুনীল, শীর্ষেন্দু, দিব্যেন্দু, দুই সমরেশ (বসু ও মজুমদার) এবং শংকর। পুরো পিয়ারলেস হল কানায় কানায় পূর্ণ ছিল শংকরকে বেশ কিছু প্রশ্ন রেখেছিল তাঁর রচনার গুণমুগ্ধেরা। প্রত্যেকটি উত্তর তিনি যথাযথ দিয়েছেন। কথার প্রসঙ্গে তিনি একটি কথাবলায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এক হাসির গুঞ্জন ওঠে, তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, এতে হাসার কারণটা কি তা আমি বুঝতে পারলাম না, কেননা তিনি বলেছিলেন 'এইখানেই' গত দুবছর আগে এক অনুষ্ঠানে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার অশোক সরকার আমারই হাতে নিহত হন। তাতে শ্রোতাদের মধ্যে হাসির গুঞ্জরন ওঠে। পরে অবশ্য তিনি বলে তাঁর মৃত্যুর সময় আমি প্রথম তাঁকে ধরি। সমরেশ বসু ও শোনালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ছিনতাই-করীদের হাতে নিঃস্ব হওয়ার ঘটনা। পুরো অনুষ্ঠানটাই খুব উপভোগ্য হয়েছিল। গুরুগম্ভীর কোনও আলোচনা হলে হয়ত এত শ্রোতা পাওয়া যেত না। কেননা শনিবার ৯ ফেব্রুয়ারী অশোক সরকার স্মৃতি বক্তৃতা-মালায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২৫ থেকে ৩০ জনের মত।

এরকম অনুষ্ঠান মাঠের মধ্যে ও হতে দেখা গেছে। 'সংবিৎ' গোষ্ঠী শতবর্ষ পরে এক নাট্যানুষ্ঠান করে, যার মূল বক্তব্য বইমেলাকে কটাক্ষ করে। কোনও রকম আলো বা মাইক ছাড়াই ১৫-১৬ জন যুব-যুবা এই নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। এদের মধ্যে একটি চরিত্রের নাম প্রেমিক বা প্রেমিক বসু – সে নাকি নারী দেখতে এসে বই এর প্রেমে পড়ে যায়। না কি, বই দেখতে এসে নারী খোঁজা।

এইবার চোখ ফেরানো যাক স্টলের সজ্জার প্রতি । শুধুই স্টল কেন গিল্ডের অফিস থেকে শুরু করে প্রধান ফটকগুলো। যে রুচিবোধের পরিচয় রেখেছে, প্রথম দু-এক বছরকে বাদ দিলে, খুবই উন্নত মানের।

বইকে আকর্ষণীয় করতে যেমন প্রচ্ছদকে দৃষ্টি আকর্ষণকারী করে তুলতে হয়, তা ভেতরে যাই থাক না কেন। প্রচ্ছদই যদি আকর্ষণীয় না হয় তার ভেতরে যতই মূল্যবান জিনিস থাকুক না কেন দর্শক আকর্ষণ করতে পারবে না। সেটা গিল্ডের কর্তাব্যক্তিদের মাথায় রয়েছে বলেই (কেননা কর্তাব্যক্তিরা প্রত্যেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশক) প্রধান ফটকগুলোকে তারা যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তোলে। 'পহলে দর্শনধারী' কথাটা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যথেষ্ট সম্মানপ্রদর্শন করেছে গিল্ডের কর্তাব্যক্তিরা। কেননা যার যা সাধ্য সেইমত মেলায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের স্টলকে সাজাতে পারেন বা সাজান। কিন্তু সবাই যে রুচির পরিচয় বহন করে সেটা কেউই হলপ করে বলতে পারবেন না। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে স্টল সাজানোর ওপর গিল্ডের তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য পুরস্কার লাভের ওপর। ফলস্বরূপ দিন দিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঝুলনযাত্রার মত। বা পুজোর প্যাণ্ডেলের মত। স্বাধীনতার প্রতি একটু বিধি নিষেধ আরোপ করার সময় এসে গেছে। নয়ত পুরস্কার নামক বস্তুটিকে তুলে দেওয়া উচিত। যেমন খুব একটা কিছু না করলেও নিম্নমানের প্রতি ও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। খুব আলোকজ্জ্বলকারী একটা স্টলের পাশে পার্টির সভার মত কোনও স্টলও যেমন বেমানান তেমনি নামের মিল রাখতে গিয়ে টালি, দর্মার বেড়া দিয়ে স্টল সাজানো কোনটাই সুরুচির পরিচয় নয়।

এইবার স্টল বিলিবণ্টনের ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। অবশ্য গিল্ডের কর্তাব্যক্তিরা তা স্বীকার করেননি। কম পক্ষে তিনখানা বই যাঁরা প্রকাশ করেননি তাঁদেরকে স্টল দেওয়া হবে না বা বিভিন্ন প্রকাশকের বই নিয়ে মেলার জন্যই কোনও নাম দিয়ে বই-এর ব্যবসায়ীদের আর স্টল দেওয়া হবে না। প্রকৃত প্রকাশক যারা তারাই একমাত্র স্টল নেওয়ার অধিকার পাবে শুধুই বিক্রেতারা নয়। যেমন গতবারের বইমেলায় এক এক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নাম দিয়ে একের অধিক স্টল নিয়েছিল। সেটা এবারসম্ভব ছিল না কেননা গতবারের তুলনায় এবারের আয়তনও ছিল যথেষ্ট কম। হয়ত সেই কারণেই এইসব বিধি-নিষেধ।

শুধু রুচিই নয় শালীনতা ও হারিয়ে ফেলছে অংশগ্রহণকারী প্রকাশক ও বিক্রেতারা। বই

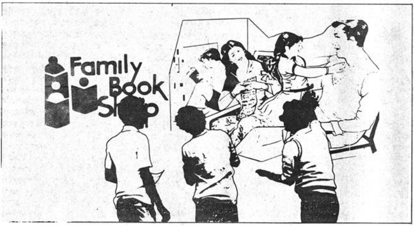

[illegible] ংসিত [illegible]না তারা রেখেছেন [illegible] [illegible]েছন [illegible]দের কারোরই দৃষ্টি [illegible]নি। বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক প্রকাশকেরই নতুন বই প্রকাশের একটা চেষ্টা থাকে। কারুর বেরয় কারুর বেরয় না। যাদের বেরলো তার মধ্যে বিশেষ করে উপন্যাসের প্রকাশকরা এক অশালীন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বাভাবিক বুদ্ধিচালিত মানুষকে পীড়িত করে তুলেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না, লেখক স্বহস্তে স্বাক্ষরে আপনাদের হাতে বইটি তুলে দিতে চান। খুব অল্প কিছু সময়ের জন্য।' শুধুই কি প্রকাশকরা দায়ী? তার জন্য অল্পবিস্তর দায় কি প্রত্যেকের ওপর পরবে না? এতে কি লেখকদের সম্মানহানি ঘটায় না? না বৃদ্ধি করে। এর প্রতি দৃষ্টি যদি গিল্ডের পক্ষ থেকে এখনই না দেওয়া হয় তবে এর ভবিষ্যত পরিণতি খুবই করুণ।

কার দোষ বেশি কারদোষ কম সে বিতর্কে না গিয়ে সমস্ত কিছুই আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু সেখানে এক বিস্তর ব্যবধান। গিল্ডের কর্তাব্যক্তিদের প্রতি মেলায় অংশগ্রহকারীদের অধিকাংশের টাকা পয়সার ব্যাপারে ক্ষোভ। সেখানে নাকি বিরাট টাকা পয়সার নয়-ছয় হয়। এমনকি যারা গিল্ডের সদস্য তারাও ক্ষুব্ধ। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই গিল্ডের সদস্য নন। তাদের প্রধান ক্ষোভ গিল্ডের কোনও রকম আয়-ব্যয়ের হিসাব তারা পাননা। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল গিল্ডের এ বছরের সম্পাদক শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি এসব ব্যাপারকে আদতেই আমল দিতে চান না। তিনি পরিস্কারভাবে জানালেন, দেখুন নিন্দুকেরা অনেক কথাই রটায় তাতে কিছু যায় আসেনা। এখানে যদি টাকার প্রতি কারোর মোহ থাকত তাহলে এই মেলা দীর্ঘ দশবছর ধরে চলতে পারত না। অনেক আগেই নষ্ট হয়ে যেত। এই সংস্থায় যারা আছেন তাদের নামের প্রচার ছাড়া আর্থিক কোনও লাভ হয়না কর্তাব্যক্তিদের। ফিরে প্রশ্ন রেখে ছিলাম আপনাদের এই যে বিরাট একটা আয় হয় টিকিট বিক্রি থেকে সে টাকাটা-কি হয়? টিকিট বিক্রি থেকে কম করে আয় হয় ২ লাখ টাকার মত। অবশ্য এর কোনও সদুত্তর পাইনি। শুধুই টিকিট বিক্রি নয় স্টল হোল্ডারদের কাছ থেকে যে টাকাটা পাওয়া যায় সেটাও কম নয় প্রায় ৩ লাখ টাকার মত। এছাড়া সুভেনিরের বিজ্ঞাপনের আয় অবশ্য এই টাকার সিংহভাগ খরচ হয়ে যায় প্যান্ডেল, আলো, জল, প্রস্রাবাগার প্রভৃতি করতে। কিন্তু বাকি টাকার হিসেব যদি গিল্ডের সদস্যদের মধ্যে জানিয়ে দেয় তাহলে তারা এই বিদ্রূপের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

শোনা যাচ্ছে আগামী বছর থেকে বইমেলার আসর বসবে কলকাতার পূর্বপ্রান্ত সল্ট লেকে। সমগ্র কলকাতার মানুষকে জমায়েত করা যেত রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে সেটা কি সল্টলেকে হবে? উদ্যোক্তারা আশাবাদী। □

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বিদ্রোহ

শিবাজি প্রতিম বসু

জানেন কি, ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ শিক্ষকরা একদিনের গণঅনশন করছেন নানা অসন্তোষ ও দাবির ভিত্তিতে? অবশ্যই সরকারি কলেজ শিক্ষকদের আদি সংগঠন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি' এই আন্দোলনের নিন্দা করেছে এবং অনশন করার সিদ্ধান্তকে 'হঠকারী' বলে বর্ণনা করেছে, কিন্তু তাদের এই নিন্দাবাক্যে আন্দোলনের তেজ কমবে বলে মনে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই পুরানো সংগঠনটি ভেঙে দু'ভাগ হয়েছে এবং এই জানুয়ারি মাসে নতুন সংগঠনটি, অর্থাৎ, 'নিখিল বঙ্গ রাজ্য সরকারি কলেজ সমিতি'র বয়স এক বছর হলো। এবং মাত্র পঞ্চাশ জন নিয়ে পথ চলা শুরু করলেও নতুন সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা তিনশোর কাছাকাছি। এছাড়া পুরানো সংগঠনের শ দুয়েক লোক এখানে 'গোপনে' চাঁদা দিয়ে থাকেন।

যে সব দাবির ভিত্তিতে এই অনশন হতে চলেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো 'বদলি নীতির পুণর্বিবেচনা' বা একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বিরোধী শিবিরের বক্তব্য হলো, বদলি এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে দলবাজি ও পক্ষপাত বন্ধ করতে হবে। একথা সকল ভুক্তভোগীরই জানা যে, পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও সরকারি কলেজের ছাত্ররা দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে কোন্‌দিন তাদের অধ্যাপক মশাই পাঠ্যক্রম শেষ না করেই বদলি হবেন, তার জন্য। এবং এই যাওয়া মানে 'নতুন কারো আসা' নাও হতে পারে! কারণ বিগত ১৯৮৩ সালে ২৩০ জন শিক্ষক বদলি হয়েছেন, ১৯৮৪ সালে এই সংখ্যা ছিল দেড়শোর কাছাকাছি। এছাড়া বিভিন্ন কলেজে শূন্যপদের সংখ্যা শতাধিক।

অবশ্যই সরকারি চাকরি, বদলির চাকরি এবং বদলি সব সময়েই হয়েছে, কিন্তু ইদানীং বিশেষ করে সাত-আট বছর নাগাদ তার হার যে পরিমাণে বেড়েছে তা নজির বিহীন। কোনও নীতির পরোয়া না করে, কেবল কিছু পাইয়ে দেবার মনোভাব নিয়ে শহরে, বিশেষ করে কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিয়োগ এবং শাস্তি স্বরূপ দুর্গম দূরবর্তী অঞ্চলে বদলি -- এই দুটি অস্ত্রের সাহায্যে আদি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সি পি এম এর সমর্থক ও অনুগামীদের পুরস্কৃত করছেন এবং উল্টোদিকে বিরোধীদের কপালে ঝুলছে, যখন তখন বদলীর খাঁড়া -- একথা নব সমিতির সদস্যগণ বললেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের বিভিন্ন শিক্ষক নেতা ও সদস্যের শ্রেণীবিভাগ করলে বলা চলে যে, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে দুটি ধারা প্রবল। একটি হলো পুরানো সংগঠন ও তার অনুগামীগণ, যার মধ্যে রয়েছেন, মানিক বল, পীযুষ দাশ, আশিস গুহ, বিমলেন্দু বিকাশ সিনহা প্রমুখ নেতা। এবং অপরটি নতুন সংগঠন, তার মধ্যে সুব্রত পান্ডা, নির্মাল্য পাল, পুলক ধর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই দুটি বৃহৎ গোষ্ঠীর মাঝে একটি প্রায় সংখ্যা বিহীন তৃতীয় ধারাও নজরে পড়বে, যাঁরা এই দুটি সংগঠনের কোনটিরও সদস্য নন। এর মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অঞ্জন কুমার সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য।

জিজ্ঞেস করি, কিন্তু মানিকবাবু যে বললেন আপনাদের কেউ 'রেকগনাইজ' করে না, আপনারা একটি 'দল ছুট' গোষ্ঠী এবং 'ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা' ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আপনারা এসব করছেন?

'ঠিক তার উল্টো' বললেন নতুন সমিতির সম্পাদক সুব্রত পান্ডা। এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আছে। কারণ, এটি একটি রেজিস্ট্রীভুক্ত সংগঠন। দ্বিতীয়ত, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ নিজে এঁদের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করেন এবং এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে একটি চিঠি দিয়েছেন, যার 'জেরক্স কপি' সংগঠনের নেতা পুলকবাবু আমাদের দেখালেন। এমন কি স্বয়ং মানিকবাবুও গত বছর একটি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর 'অফিসিয়াল প্যাডে' নতুন সংগঠনকে সম্বোধন করে একটি চিঠি দেন, সুতরাং 'অস্বীকৃতির প্রশ্নই নেই।' 'আর উচ্চাকাঙ্খা?' এর উত্তরে মৃদু হেসে, সুব্রতবাবু জানালেন যে, 'উচ্চাকাঙ্খাই বটে', তা এমনি উচ্চাকাঙ্খা যে আমাকে তিন বছরের মাথায় (টার্ম শেষ না হতেই) আবার বদলি হতে হলো দার্জিলিং-এ, অথচ তার আগেই আমি নর্থ বেঙ্গলের টার্ম শেষ করে এসেছি... আর অঞ্জন সরকারকে বদলি করা হলো বারাসতে। অথচ মানিকবাবু দীর্ঘ সাত বছর কেবল কলকাতাতেই আছেন তা নয়, দুবার তাঁর বদলির আদেশ রদ করিয়েছেন। পীযুষ দাশকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

বিভিন্ন মহলে, এমন কি পুরানো সংগঠনের সদস্যদের (এর মধ্যে আছেন অধ্যাপক অমলকান্তি ভট্টাচার্য প্রমুখ) কথা বলে যা জানতে পারলাম তা হলো, সমস্ত সমস্যাটির মূলেই রয়েছে সরকারি কলেজগুলির 'ইচ্ছাকৃত অবমূল্যায়ন।' এমনিতে সরকারি কলেজের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। কিন্তু যোগ্যতা ও ফলাফল সবদিক থেকেই এ দেশের শিক্ষাজগতে তার অবদান তুলনাবিহীন। বেসরকারি কলেজ এবং এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চেয়েও ভাল কেরিয়ার সম্পন্ন অধ্যাপকবৃন্দ এইসব কলেজের বিশেষ গৌরব। ফলত, সঙ্গতকারণেই ১৯৭৬ সালের নতুন বেতনক্রম চালু হবার আগে অবধি এখানকার শিক্ষকবৃন্দ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি মাইনে পেতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এখানকার বেতনক্রম 'নামিয়ে' অন্যদের সঙ্গে 'সমতা' আনা হয়। কেবল তাই নয়, এরপর থেকে যা কিছু সুযোগ সুবিধা, 'অ্যালাউয়েন্স' সব কিছুই এসেছে বেসরকারি কলেজের হাত ধরে। এছাড়া বেসরকারি কলেজে অবসর গ্রহণের পরও প্রায় বছর পাঁচেক অবধি 'এক্সটেনশান' পেতে পারেন। তাছাড়া, রাজনীতি করা, মন্ত্রী হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনও বাধা নিষেধ নেই বেসরকারিদের বেলায়। কিন্তু সরকারি শিক্ষকদের বেলায় কেবল বদলি।

এখন সরকার ও প্রশাসন কখনো প্রকাশ্যে, কখনো সুক্ষ্মভাবে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছেন। কারণ, রাজ্য রাজনীতিতে বেসরকারি শিক্ষকদের শিবিরটি বেশ শক্তিশালী। বিরোধীদের অভিযোগ যে, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠনটি যদি এতো কিছু সত্ত্বেও রাজনীতি বা 'বামফ্রন্টপ্রিয়তার' ওপরে শিক্ষক স্বার্থকে স্থান দিতেন, তবে হয়তো কিছুটা 'আন্দোলন-মুখী' হওয়া যেত, প্রতিবাদ করা যেতো, মুখ বুজে এতো অন্যায় সহ্য করতে হতো না। কিন্তু পুরানো নেতৃবৃন্দ নিজেরাই যেন বেসরকারিদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। ফলে ধামাচাপা পড়ে গেল বহু সমস্যা। আর প্রতিবাদ করলেই ব্যবহার করতে লাগলেন তাঁদের অস্ত্র যথেচ্ছ বদলি, যা ইতিমধ্যেই প্রশাসনের সঙ্গে আঁতাতের ফলে তাঁরা অর্জন করেছিলেন। অন্য দিকে বাধ্য ও অনুগত শিক্ষকদের জন্য রইল পুরস্কার। প্রথমত, ভালো জায়গায় বদলি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগের মারফৎ এই পুরস্কার দেওয়া হলো। ফলে আবার 'দুর্নীতি' ও 'অবমূল্যায়ন'। এইভাবে এক কাসের ... গড়ে উঠেছে।

...দের বক্তব্য হলো, যে পুরানো

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দু একটা 'লোক দেখানো' প্রতিবাদ করছেন বটে, কিন্তু এঁদের আসল চরিত্রটা পরিষ্কার হয়ে গেছে 'এড হক' হিসেবে নিযুক্ত শিক্ষক এবং ডেমোনস্ট্রেটরদের সমস্যার বেলায়। বস্তুত, এই 'এড হক' সমস্যা নিয়েই পুরানো সংগঠনে বিরোধের সূত্রপাত, আসলে, কংগ্রেস আমলে সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে, 'এড হক' ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকে পি এইচ্ ডি অবধি ছিলেন। কিন্তু এঁদের দিন কাটতো চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায়। কারণ, এঁদের স্থায়ী করা হচ্ছিল না। কিন্তু যখন কিছু অধ্যাপক এই নিয়ে কিছু করতে নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেন, তখন ওঁরা তা অস্বীকার করেন, গোপনে বলেন, 'ওরা কংগ্রেসী' অথচ এঁরা সবাই হলেন সমিতির সদস্য। এই অবস্থায় ১৯৭৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকতে নেতৃবৃন্দকে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এই অধিবেশনে হেরে যাবার ভয়ে নেতৃবৃন্দের অনুগামীগণ গন্ডগোলের সৃষ্টি করে মিটিং ভেঙেগ দেন, তখন থেকেই এটা বুঝতে পারা যায় যে, নেতৃত্বে পরিবর্তন দরকার।

দ্বিতীয়ত, কিছুদিন আগেই বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 'ডেমোনস্ট্রেটার'দের পদটিরই বিলুপ্ত করে তাঁদের লেকচারের বেতন ক্রমে নিয়ে যাওয়ার কথা। "প্রতিক্রিয়াশীল" বিহার, উত্তরপ্রদেশ যে নিয়ম চালু করলো, "প্রগতিশীল" পশ্চিমবঙ্গ তা পারলো না। এখানে তাঁদের মাইনে প্রাইমারী শিক্ষকদের চেয়েও কম। অথচ এঁদের মধ্যে বহু উচ্চ শিক্ষিত এমনকি পি এইচ ডি অবধি আছেন।

এইসব কিছুর প্রতিবাদই সুব্রত বাবুদের সংগঠন ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একদিনের 'গন অনশন' পালন করবেন। এবং এই আন্দোলনের ছাপ ছাত্র সমাজের ওপরেও পড়বে বলে মনে হয়। কারণ ইতিপূর্বেই বিভিন্ন সময়ে তারা যখন তখন এবং 'যোগ্য' শিক্ষকদের বদলি করার প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

মানিকবাবুদের মতে নতুন সংগঠনটি 'নকশাল', কিন্তু সুব্রতবাবু জানালেন, তাহলে দিলীপ চক্রবর্তী, 'এস ইউ সি'র সুবীর বসু ওঁরাও কি 'নকশাল?' দিলীপ বাবু, সতীন চক্রবর্তী ওঁদের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, কিন্তু ওঁরা এখানে যা বক্তব্য রাখেন, তা ওঁদের 'ব্যক্তিমত'। অন্যদিকে মানিকবাবুরা যে 'সি পি এম' তা চিনতে বাকি থাকে না, যখন দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট নির্বাচনের আগে সি পি এমের গণশক্তিতে মানিক বল এবং পীযুষ দাশের নাম বাম সমর্থিত তালিকায় বেরোয়।

নতুন সংগঠন অবশ্য জানালেন যে, তাদের মধ্যে বামফ্রন্ট বিরোধিতার 'কোনও ব্যাপার নেই' কিন্তু নানা সময়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে, এটা হলো বামফ্রন্ট বনাম ফ্রন্ট বিরোধী শিবির, যার মধ্যে রাজনৈতিকভাবে দেখলে 'গণ সংঘর্ষ সমিতি'তে যাঁরা আছেন (অর্থাৎ, জনতা, এস ইউ সি, বিজেপি, নকশালদের বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রভৃতি) তাঁরা এবং কংগ্রেসের কিছু ব্যক্তি আছেন। তবে এর মানে এই নয় যে এখানে নিরপেক্ষ কেউ নেই।

'আমরা ঠিক কি ভুল করেছি সে বিচার করবে কাল,' বললেন সুব্রতবাবু। "আমাদের সরকারি মামা দাদা নেই, পয়সা নেই, তবু আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী।" তাঁর বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের সংগঠন অঞ্জন কুমার সরকারের মতো 'প্রকৃত সংবেদনশীল' বহু মানুষকে কাছে টানতে পারবেনই, এখনও যাঁরা কোনও সংগঠনে নেই।

'আমরাও ঐক্য চাই তবে নীতিহীন আপোষ নয়,' বললেন তরুণ সুব্রতবাবু, 'চাই ভয়মুক্ত, বিদ্বেষহীন, সুস্থ পরিবেশ এবং একটি সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি।' □

ধারাবাহিক

মরজি মহল

বনফুল

।। ১৯ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

সারাদিন মেঘ মেঘ বৃষ্টি আর বৃষ্টি
ভেসে গেল পথ ঘাট – একি অনাসৃষ্টি।
তবু কিন্তু বন্ধ নেই আমাদের কৃষ্টি
সভা-টভা হচ্ছে খুব। তপনের দৃষ্টি
কর্কট থেকে সোজা মকরেতে পড়েছে
রবি–শনি বাপ–ব্যাটা কর্কটে লড়ছে
সুতরাং কি যে হবে শুয়ে শুয়ে ভাবছি
স্বর্গেতে উঠছি ও পাতালেতে নাবছি
১৩০৬ সালে হয়েছিল জন্ম
শুনেছি আমার নাকি মকরটাই লগ্ন
সেই মকরের পরে শনি রবি যুযুধান
বর্ষায় কোন সুরে বল গাই কোন্ গান
কিছুই গাইব না– থাকব কেবল মাম্'
চাদরটা মুড়ি দিয়ে তাই শুয়ে পড়লাম।

।। ২০ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

সারা বাংলা শরৎ শতবার্ষিকী উৎসব হবে। তার প্রথম মিটিং আমাদের বাড়িতে হল আজ সকালে। প্রায় জন-চল্লিশেক লোক এসেছিল। পুতুল সিঙাড়া সন্দেশ দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করল।

অধ্যাপক প্রফুল্ল হোড় রায়ও এসেছিল অধ্যাপক সুরেশ মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে। দেখতে দেখতে দু'ঘন্টা শেষ হয়ে গেল, পড়াশোনা কিছু হল না।

জীবন যৌবন ক্ষণস্থায়ী
এর জন্য দায়ী –
কে – কে – কে?
ধরে নিয়ে এস সেই ব্যাটাকে।

।। ২১ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

বাংলা মতে আজ আমার জন্মদিন। বন্ধুরা উপহার নিয়ে আসছেন। ৭৭ বর্ষে পদার্পণ করলাম। মৃত্যু আরও একটু এগিয়ে এল। যেদিন জন্মেছি সেইদিন থেকে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। এই এগিয়ে যাওয়াটাই জীবন। সেই জীবনকে কেন্দ্র করে কত কান্ড। আমরা জানি এ জীবন নশ্বর। এ-ও জানি নশ্বর বলেই এ জীবন এত প্রিয়।

আজ বাবা মাকে মনে পড়ছে। তাঁরা আজ কোথায়? আজ তাঁরা তাঁদের এই বৃদ্ধ পুত্রকে দেখলে কি খুশি হতেন? একদিন আমি ছুটে বেড়াতাম। আজ আমি বাতে চলতে পারি না। লীলা শয্যাশায়ী। না, তাঁরা খুশী হতেন না। তবু আজ তাঁরা নেই এজন্য কষ্ট হচ্ছে।

।। ২২ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

আজ সমস্ত দিন কাটল টি. ভি. নিয়ে
সকাল ন'টার সময় গিয়ে
ফিরলাম সাড়ে তিনটের সময়
ওদের কাজকর্ম এখনও গড়গড় নয়।
পাঁচ মিনিটের টক্ দিতে
সাড়ে ছ-ঘন্টা কাবার
এতে শ্রাদ্ধ হয়ে যেত
চন্দ্রগুপ্তের বাবার।
ফিরে দেখি অসীম আমার জন্যে
অপেক্ষা করছে
আজই সে বর্ধমান যাচ্ছে।
প্রণাম করে চল গেল, বেজে উঠল ফোনটা।
উদাস উদাস হয়ে গেল মনটা
তাছাড়াও আর, আর যা হ'ল
তা অবর্ণনীয়
আন্দাজ করে নিও।
খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম
তারপর খেতে বসলাম।

।। ২৩ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

আজ সকালে আমার মেডিকেল কলেজের বন্ধু ননী সাহার মেয়ে এবং ছেলে – প্রসাদী আর নির্মাল্য এসেছিল। খুব ভালো লাগল। ননী কিছু টাকা রেখে গেছে দরিদ্রসেবার জন্য। একটা ক্লিনিক খোলা হবে তার জন্মদিনে। আমাকে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। যাব।

মেঘের ফাঁকে নরম রোদ
উঠছে হাসি হাসি
চমৎকার খাস্তা লুচি
কিন্তু যেন বাসী।
বাসী হোক কিন্তু সেটা
লাগছে বড় ভালো
দুপুর বেলা উঠল যেন
ভোরের কচি আলো।

।। ২৪ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

লোকসভার প্রচুর ভোটাধিক্যে
ইমার্জেন্সি বিলটি হল পোক্ত
শক্ত হল ইন্দিরাজীর হস্ত
জুজু-ভীত এবং হুজুর-ভক্ত
আমরা যে সবা, হল তা সাব্যস্ত
পাওয়া গেল প্রমাণ আর এক প্রস্থ
নিয়মিত পাই যদি ভুষি এবং খৈলো
খোয়াড়েতেই থাকব
ডেমোক্র্যাসি শিকেয় তোলা রইল।

আনন্দবাজার পত্রিকায়
হায় হায় হায়
বড় বড় অক্ষরে প্রথম পাতায়
মুদ্রিত চোরের খবর
জবর জবর।

।। ২৫ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

ইন্দিরাজী আজ এক Mexican সাংবাদিককে বলেছেন – "শৃঙ্খলা (Discipline) না থাকলে কোনও দেশ অগ্রসর হতে পারে না।" খুব ঠিক কথা। কিন্তু ওর সঙ্গে 'সততা' কথাটাও জুড়তে হবে। একদল চোরও শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কিন্তু তা আমরা চাই না। আমরা সৎ, শিক্ষিত, স্বদেশ প্রেমিক এবং শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত লোক চাই। দেশ অমানুষে ভরে গেছে। এখন মানুষ গড়ার দিকে মন দিতে হবে। ইন্দিরাজী সেদিকে কবে মন দেবেন? আমাদের স্কুল কলেজগুলো তো মস্তান গুন্ডাদের আড্ডা হয়ে উঠেছে। সেতারে সুর বাঁধা হয় নি তাই আমাদের জয়জয়ন্তী আলাপ জমছে না। সুর বাঁধা হয় স্কুল-কলেজে। সেখানে আজকাল কেবল বেসুরো হুল্লোড় চলছে।

শতদলের পরে যেথা
সরস্বতীর থাকার কথা
যেখানেতে বাজা উচিত বেণুবীণার সুর
সেখানেতে বাজিয়ে টিন
নাচছে যারা তা ধিন্‌ধিন্
মদেতে চুরচুর
হ্যা হ্যা করে হাসছে যারা উন্মত্তবৎ
তারাই কি দেশের ভবিষ্যৎ?

ইন্দিরাজী এদিকে মন দিচ্ছেন না কেন?

।। ২৬ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

আজ মনোজ বসুর সম্বর্ধনা সভা হল প্যারাডাইস হলে। গিয়েছিলাম। সভাটা হবে অনেকদিন থেকেই শুনছিলাম। সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করবাবু আর প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার। তুষারবাবুও মিনিট কয়েকের জন্যে বসেছিলেন এসে সভায়। কাগজের রিপোর্টারাও ছিলেন। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এবং বিনয় মজুমদার মশাই প্রধান উদ্যোক্তা।

রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি হল খুব
আমাদের পাড়া ডাই উঠিল কম্পিয়া
স-বজ্র শ্রাবণ যেন পড়িল ঝম্পিয়া
মাখিয়া তুলিব মুখে সচিংড়ি ভাত
চমকাইয়া উঠিলাম: হল বজ্রপাত।
দোর জানলা বন্ধ কর সব ছিদ্র ফাঁক
এত রাত্রে সাড়ম্বরে পিটাইয়া ঢাক
নিজেরে জাহির করে পাগল শ্রাবণ
লোভন কি এ রকম আত্ম-বিজ্ঞাপন?
তিস্তাকে লয়ে চন্দ্রা গেছে নিমন্ত্রণে
এ দুর্যোগে জানি না সে
ফিরিবে কেমনে।

।। ২৭ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

কালকের মনোজ সম্বর্ধনার খবরটা আজ আনন্দবাজারে বেরিয়েছে দেখলাম। Statesmanএ বেরোয় নি। ওই টাঁস মার্কা কাগজটা পারতপক্ষে আমাদের বাঙালী সাহিত্যিকদের খবর ছাপে না যদি সে টাঁস-গন্ধী না হয়। স্টেটসম্যানে আজ চিড়িয়াখানার বাঘের খবর আছে, মনোজের খবরটা নেই। অথচ এই কাগজ আমাদের পয়সা দিয়ে কিনে পড়তে হয়, কারণ দেশে ভালো সংবাদপত্র নেই।

আজ বিকেলে মন্টুদের স্কুলে বর্ষামঙ্গল উৎসবে গিয়েছিলাম। এটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ট্রেনিং স্কুল। তাঁরা আমাকে সম্বর্ধনা দিলেন একটি। বাটিকে আঁকা একটি অজন্তার ছবিও উপহার পেলাম। সবিতাব্রত এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায় গানও শোনালেন অনেকগুলি। খুব ভালো লাগল। স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মৃণালিনী দাশগুপ্তার আন্তরিক আতিথেয়তা সত্যিই হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

।। ২৮ জুলাই– ১৯৭৫ ।।

ইন্দিরা গান্ধীরে কয় ইন্দুরগণ
ওগো মহারানী লহ অভিনন্দন
তোমার কৃপায় দেবী ধান চাল গম
গুদামে গুদাম ভর্তি খেয়ে হরদম
করিতে পারি না শেষ। হে মহা ইন্দ্রাণী
তবুও তোমার পদে রাখি এই নিবেদনখানি
বহুমূত্র রোগগ্রস্ত অতি-ভোজী অনেক মূষিক
তাদের চিকিৎসা লাগি ব্যবস্থা কি করেছেন ঠিক?
যদিও ইঁদুর মোরা অতি অভাজন
তবু তো সন্দেহ নাই ভারতেরই মোরা সিটিজন।

সাহিত্য জগৎ বিরাট এবং বিচিত্র। বিশাল একটা মেলা যেন – সেখানে অনেক ব্যাপারীর অনেক দোকান। সব দোকানই কিন্তু মিষ্টির দোকান নয়। পাটের কারবারী আছেন, ইঁটের কারবারী আছেন। মুশকিল হয় যখন পাটের কারবারী বা ইঁটের কারবারী মিষ্টির দোকানে এসে মোড়লী করতে চান। এরকম হামেসাই হয়।

কবির সভায় যেথা আশা করি মর্মের গান
ব্যবসায়ী সেথা চর্মের মহিমা আওড়ান।

।। ২৯ জুলাই – ১৯৭৫।।

আজ সকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম শ্রীযুক্ত বিজয়সিং নাহার, কাশীকান্ত মৈত্র এবং আরও তিনজন কংগ্রেস পরিষদ দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছিল।

'হ্যাঁ'য়ে যারা 'হ্যাঁ' মেলাতে পারবে
থাকবে তাঁরাই দলে
নিরঙ্কুশ শাসনকার্য চিরকালই
এই নিয়মেই চলে।

Statesman কাগজে কিন্তু খবরটা দেখলাম না সেখানে আমেরিকার ফোর্ড সাহেব 'বন' থেকে Warsawতে গিয়ে কি বলেছেন – তাই বেরিয়েছে। একটা মোক্ষম খবর কিন্তু Statesmanএ দেখলাম – Charges against Badal and

others to be found true: শ্রী প্রকাশ সিং বাদল Akali ministryতে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা দুর্নীতি পরায়ণ ছিলেন ঘোষণা করেছেন Chhagani Commission: এ কমিশন চার বছর আগে নিয়োজিত হয়েছিল। এতদিন পরে রায় দিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় এ খবরটা নেই।

খবরের কাগজগুলোর
আশ্চর্য কৌশল
Flash আর Blackout
চলছে অনর্গল

৩০ জুলাই – ১৯৭৫ ।।

শ্রাবণ-চিন্তাঃ ত্রিবিধ

১
আহা দেখিতে লাগিছে বড় ভালো।
শ্রাবণ মেঘের লীলা
ঢাকিল নভের নীলা
কৃষ্ণ যেন কালীতে মিলালো
বিজলী-খড়্গের ভাতি
চমকিছে দিবা রাতি
খেলা করে কালো আর আলো
ঝিম ঝিম ঝম ঝম
কার গানে মনোরম
বলে যেন আলো জ্বলো জ্বালো।

২
শ্রাবণের প্রভাত
দুষ্ট মেয়ে যেন একটি
কেবল বৃষ্টিতে ভিজছে
আর হাসছে।

৩
সারা আকাশ মেঘে মেঘে ল্যাপা
চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় দিগম্বর ক্ষ্যাপা
যখন খুশী হাসে
যখন খুশী কাঁদে
যখন খুশী চেঁচিয়ে ওঠে অতি উচ্চ নাদে
যখন খুশী নৃত্য করে নূতন রকম
জলসা
আমরা তার নাম দিয়েছি বর্ষা।

।। ৩১ জুলাই – ১৯৭৫ ।।

আজ সকালে বেশ রোদ উঠেছে। কাল বিকেল থেকেই নেই। কাল বিকেলে স্বর্গীয় ডাক্তার ননী গোপাল সাহার বাড়ি গিয়েছিলাম। তার নামে তার বাড়িতে একটি ক্লিনিক আজ খোলা হল দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। খগেনদা -ও (মেজর কে. কে. ঘোষ) এসেছিলেন । ননী আমার সহপাঠী ছিল। ৩ নং মির্জাপুর স্ট্রীটে এক ঘরে থাকতাম আমরা। দাদা বলতাম তাকে। দাদা শুধু যে আমার পরম বন্ধু ছিল তা নয় আমার হিতৈষী অভিভাবক ছিল। আমার মতো খামখেয়ালী লোককে সর্বদিক আগলে আগলে বেড়াত। এমন বন্ধু কি আজকাল পাওয়া যায়? ১৯২০-১৯২৫ আমরা এক সঙ্গে এক মেসে ছিলাম। আজ এতদিন পরে তার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিদের দেখে এবং তার নামে ক্লিনিক উদ্ঘাটন করে পরম [illegible] করেছি।

।। ১ আগস্ট – ১৯৭৫ ।।

আজকের কাগজে সুসংবাদের বান
নির্দোষিদের সাজা চান না ইন্দিরা
দোষীদের চান
বিদেশী মুদ্রা রেখেছেন, দিয়ে চোরা চালান
গায়ত্রী তাই গ্রেপ্তার হলেন হয়ে হতমান
মাঝে মাঝে হচ্ছে ভয়
লোম বাছতে কম্বল না লোপাট হয়।

খগেনদা (মেজর কে. কে. ঘোষ) আজ এসেছিলেন লীলাকে দেখতে। সদানন্দময় পুরুষ তিনি। খানিকক্ষণের জন্য সব আনন্দময় হয়ে উঠল।

আজও বিশেষ বৃষ্টি হল না
তুফান বইছে দখিন হাওয়ার
একটা কুকুর খালি চাঁচাচ্ছে
গোলমাল বোধহয় খাওয়ার
তার উপর সর্বদা বাঁধা
স্বাধীনতা নাই
শব্দবৃক্ষের আশ্রয় নিচ্ছে তাই
আমাদের কানে ধরল তালা
ভগবান কিন্তু মনে মনে কালা।

।। ২ আগস্ট – ১৯৭৫ ।।

দুর্যোগ তো আসবে জানি
আসবে ঝড় আঁধি
চলতে হবে তবু মোদের
সাহসে বুক বাঁধি
এই ঘোষণা করেছেন
ইন্দিরা গান্ধী।

৩৫ টি জাতি হেলসিংকিতে ঘোষণা করেছেন আমরা সকলে শান্তিতে সহাবস্থান করব। দল বেঁধে এরকম ঘোষণা করলেই ভয় হয় ভিতরে কোনও গলদ আছে।

ইমার্জেন্সির ফলে
জল এসেছে কলে
পিওন দিচ্ছে চিঠি
ঠিক সময়ে বসছে আপিস
নেই কো খিটিমিটি
বে-টিকিটের প্যাসেঞ্জার
হচ্ছে সব গেরেপ্তার
ট্রেন হয় না লেট
হুদো হুদো ধরা পড়ছে চোর
খুলছে জেলের গেট।
এর সঙ্গে করতো যদি

ট্যাক্সের রেট
এবং যদি ভরত মোদের পেট
বলতাম ইন্দিরাজী – সত্যি তুমি গ্রেট।

।। ৩ আগস্ট – ১৯৭৫।।

সকাল থেকেই নানারকম
লোকের সমাগম
লেখাপড়া হল না একদম।
কাগজ পড়াও হয় নি আজ
সময় এত কম।
এক ফাঁকেতে আনন্দবাজার
দেখলাম উলটিয়ে
প্রথম পাতায় খবর দেখি
কিশোরী এক মেয়েকে ফুসলিয়ে
নিয়ে গেছে মহাপুরুষ কোনও
তারই একটা বিশদ বিবরণও
ছেপেছেন তাঁরা
ভবিষ্যতের মিস্ মেয়োরা (Miss Mayo-রা) আনন্দেতে
হবেন আত্মহারা
পাবেন অনেক খোরাক
তাঁদের জন্য এসব খবর
শিকেয় তোলা থাক।
ভালো লোকের খবর মোরা চাই
কোন কাগজে কোথায় সেটা পাই?
চোর বদমাস মস্তান
এদের খবর পড়ে পড়ে অতিষ্ঠ যে প্রাণ।

।। ৪ আগস্ট – ১৯৭৫।।

সৃষ্টিধর্মী কাব্য সাহিত্যের (এর মধ্যে ছোটগল্প, উপন্যাসও পড়ে) প্রধান কথা হচ্ছে রস।

রসোত্তীর্ণ না হলে তা কাব্য সাহিত্যের আসরে কিছুতেই পাঙক্তেয় হবে না, তবে যতই না অন্য গুণ থাক। সৃষ্টিধর্মী কাব্যের আর একটি প্রধান গুণ অনন্যতা। পল্লীগ্রামের বা শহরের বা প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা করার মধ্যে একটা নিপুণতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাতে যদি অনন্যতা না থাকে তাহলে তাকে প্রথম শ্রেণীর কাব্য বলতে ইতস্তত করব। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, তিলোত্তমা, আয়েসা, কমলাকান্ত – এসব অনন্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের গোরা, নিখিলেশ, শচীশ, দামিনী এরাও। অর্থাৎ এদের মতো লোক কোথাও কোথাও পাওয়া যায় না, এরা কারও 'কপি' নয় – এরা কবিদেরই সৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী বা দেবদাস বা শ্রীকান্ত রসোত্তীর্ণ মনকে খুব নাড়া দেয় কিন্তু ওসব সৃষ্টিতে অনন্যতা আছে কি? ওসব চরিত্র রসোত্তীর্ণ, উপাদেয় কিন্তু অনন্য নয়। একটি অনন্য সৃষ্টি করেই Swift পৃথিবীর সাহিত্য সম্রাটদের আসরে সসম্মানে অভ্যর্থিত হয়েছেন – সে বইটির নাম গালিভার্স ট্রাভেলস্। এ রকম অনেক উদাহরণ আছে। আর একটা মনে পড়ছে Alice in wonderland আনাতোল ফ্রাঁসের থেই (Thais) আর একটি। সেক্সপীয়র এরকম অনন্য সৃষ্টি অনেক করেছেন। গোটের 'ফাউস্ট', বা মিলটনের শয়তানও অনন্য সৃষ্টি। ভিক্তর হিউগো লা মিজারেবল্স-এ যে জাঁ ভালজাঁ, বা পাদ্রী, বা ফ্যানটিন সৃষ্টি করেছেন সেগুলি অনন্য। অনবদ্য। বিদেশী সাহিত্যে এরূপ অনন্যতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারতও আছে বাংলা সাহিত্যে কিন্তু বেশী নেই। বাংলা সাহিত্যে আমরা জোর দিই – সাহিত্যের বিষয়ের উপর। ইনি শ্রমিকদের কথা লিখেছেন, উনি গ্রামবাংলার কথা লিখেছেন। তিনি কয়লা খনির চিত্র এঁকেছেন। আর একজন মধ্যবিত্তদের ছবি এঁকেছেন। অনেক সময় চিত্রগুলি ভালো হয়েছে, রসোত্তীর্ণও হয়েছে, কিন্তু সেগুলি অনন্য সৃষ্টি হয় নি, কারণ সেগুলি বাস্তব জীবন্ত চরিত্রগুলির 'কপি' সৃষ্টি নয়। অনেক সময় যাঁরা বলেন যে অমুক সাহিত্যিক দেশের মাটি থেকে রস টেনে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বলেই খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক তাঁরা ভুলে যান যে অনন্য সৃষ্টি না করতে পারলে স্রষ্টা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন, পুরস্কার পেতে পারেন কিন্তু স্রষ্টা হতে হলে সৃষ্টিতে অনন্যতা থাকা প্রয়োজন।

যা ছিল না তাই তোমাকে করতে হবে সৃষ্টি
তবেই হবে স্রষ্টা
বিশ্বকর্মা নকল কভু করেন নিকো কারো
তাই তো তিনি তৃষ্টা।

।। ৬ আগস্ট – ১৯৭৫।।

কাটিহারের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্র তপন চৌধুরী এবার স্কুলফাইনালে প্রথম হয়েছে। খবরটি আনন্দজনক। এই স্কুলটি বিহারে অবস্থিত, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য শহরেও – যেখানে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী বেশী – সেখানেও এরকম স্কুল থাকা উচিত।

কাটিহার শহরকে না কি মহানন্দা ও কোশী প্লাবিত করবে – এই রকম একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইনজিনিয়ররা যুদ্ধে নেমেছেন – স্টেটসম্যানে দেখলাম আনন্দবাজার যে খবরটি ফলাও করে ছেপেছেন সেটি ঊর্মিলা পনটেলের আত্মহত্যার কাহিনী। কাহিনীটি রহস্যময়। তিনি আফ্রিকায় থাকতেন, মনে মনে গুরুর নির্দেশ পান – তুমি রাঁচি আশ্রমে এসে বাস কর। তিনি মোমবাসার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ভারতে চলে আসেন। কিন্তু রাঁচির আশ্রম তাঁকে আশ্রয় দেয় নি। পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন পাগল নয়। তখন তাঁকে রাঁচির একটা নিরামিষ হোটেলে রাখা হয়। সেখানেই তিনি কাপড়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি বেশ ধনী এবং বিদুষী ছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে এক জায়গায় লেখা আছে – আত্মহত্যা করলে কি তোমার নাগাল পাব? মনে হয় উনি কারো প্রেমে পড়েছিলেন।

যিনি নাগালের বাইরে। প্রেমের প্রকাশ
বহুরূপী। মহর্ষিরা কন চুপিচুপি।

At Webel, that's what we're trying to do

To keep up with electronics you must run fast.

The world of Electronics is surging forward at a tremendous pace, opening up new vistas in human life. In West Bengal today, Webel is witness to a new awakening of enterprise in electronics. An upsurge is taking place. And Webel is here to welcome it, to channelise it, to go along with it into the future.

How?

By identifying new entrepreneural zeal. By promoting innovative technical talents with financial assistance. By laying down the foundations of a growth oriented infrastructure.

In the 10 years of its existence, Webel has established 14 manufacturing companies, some in the joint sector and some wholly owned. With products ranging from electronics components to sophisticated systems. And the 7-acre electronics industrial estate at Taratala, Calcutta.

At Salt Lake City, work moves ahead on a 40-acre electronics complex. Some of the units located there will soon be on stream. Close to this complex, a sprawling 93-acre land have been earmarked for the electronics industry. Situated only about 10 km. away from the city centre of Calcutta, the Salt Lake Complex offers an ideal environment for the growth and development of electronics.

Webel's key task today is to motivate the entrepreneurs of tomorrow to come forward in greater numbers, and with greater endeavour. Webel is committed to

- help potential electronics projects, both in the large and the small sectors
- take electronics enterprise to the districts
- diversify into newer areas of electronics manufacture.

Today, Webel is doing its best to meet the needs of the future. Tomorrow, there will be much more to do, many more horizons to be opened up. That's what electronics is all about.

Webel

West Bengal Electronics Industry Development Corporation Ltd.
(A Govt. of West Bengal undertaking)
225E, Acharya J. C. Bose Road,
Calcutta-700 020.

PARICHAY-WL3/84

অশোক সেনের চিন্তাধারা

কাজু মুখোপাধ্যায়

কথায় কথায় অশোক সেন সকলকে রেড রোড দেখিয়ে থাকেন। বলেন, বাঙালীকে যদি জানতে চাও তাহলে রেড রোড দিয়ে লাল দীঘিতে এসো। যেতে যেতেই স্বামীজী, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, যতীন দাশ, ...ঙ্গিনী হাজরা, চিত্তরঞ্জন দাশ, সূর্য সেন, ...রাম, বিধান রায়, বিনয়-বাদল-দীনেশ ...দের সাক্ষাৎ পাবে। এঁরাই বাংলা। ...ার ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ। বাঙালী এঁদের ভুলতে পারে না কোনোদিন, ভোলেও নি।

একদিন দমদম বিমান বন্দরে কমলনাথের বিদ্‌ঘুটে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা দেখে, অশোক সেন ব্যাথিত হয়েছিলেন। "বাঙলার নেতা কমলনাথ জিন্দাবাদ" -- ধ্বনিতে বিমান-বন্দর ভবনটি কাঁপছিল। একের পর এক মালা পড়ছিল কমলনাথের গলায়। অশোক সেনকে দেখে এক গুণমুগ্ধ ভক্ত তাঁর গলায় মালা পরাতে গেলো। অশোক সেন আপত্তি করলেন। বললেন, "আমি বাংলার নেতা নই। তোমরা যে বাংলার নেতাকে খুঁজে পেয়েছো, আমি তাঁকে নেতা বলে মনে করি না।"

কথাটা কয়েকজন সাংবাদিককে বলেছিলেনও। এবং যথারীতি তাঁর মন্তব্যগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়েছিল। পরে একদিন, কমলনাথ মি: সেনকে বলেছিলেন, "দাদা, আপনি আমাকে এতো স্নেহ করেন, তা হলে অমন কথা বললেন কেমন করে?" তার জবাব ছিল সহজ। ওই রেড রোড থিয়োরি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "তুমি কি ওঁদের মত নেতা?" কমলনাথ সবিনয়ে বলেছিলেন, "না, না। আপনি ঠিকই বলেছেন।"

নেতা বলতে অশোক সেন এমন ব্যক্তিকে বোঝেন যিনি নিঃস্বার্থ, নিরাসক্ত, নীতিনিষ্ঠ এবং নিষ্ঠাবান। দেশ এবং দলের জন্য যিনি সবসময় সবরকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এই সংজ্ঞায় বাহুবলে বলীয়ান তথাকথিত যুব নেতারা পড়েন না। অশোক সেন স্পষ্টই বলেন, "আমি মাসলম্যানদের নেতা বলে মনে করি না।"

কিন্তু আপনাকে তো অনেক মাসলম্যান সমর্থন করে? বিদ্যে-বুদ্ধি-অর্থ এবং বাহুবল -- এর সবকটিতেই তো আপনি সকলের উপরে। এই প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে বলেছিলেন, "কেউ সমর্থন করলে বাধা দেওয়া যায় না। কিন্তু সমর্থন করা আর নেতা হওয়া এক জিনিস নয়।"

স্বাধীনতার পর ভঙ্গ-বঙ্গের রাজনীতিতে ড: বিধান রায়ের হঠাৎ আবির্ভাবের সঙ্গে '৮৫র অশোক সেনের অনেক মিল আছে। দুজনেই বয়েসে আর সকলের চেয়ে বড়, কিন্তু কর্মক্ষমতা অটুট। বয়েস বেশি হয়েছে, তা বোঝাই যায় না। বিদ্যে-বুদ্ধি এবং অর্থবল কার বেশী, কার কম, হিসেব করা মুশকিল। তবে পার্থক্য আছে। ড: রায়ের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর সামনে সাধারণ মানুষ ঘেঁষতেই সাহস করত না। বিরোধী দলের তাবড়-তাবড় নেতারাও সামনে গিয়ে আমতা-আমতা করে 'স্যার-স্যার' বলতেন। ঝানু সাংবাদিকেরাও সাংবাদিক সম্মেলনে কোনো প্রশ্ন করতেন না। ড: রায় ডিক্টেশন দিতেন, সকলে লিখে যেতেন। ডিক্টেশন শেষ হলে বলতেন, "আচ্ছা, এবার তোমরা যাও।" সকলে সুবোধ বালকের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। বিধান রায়ের সামনে কোনো নেতা অথবা সাংবাদিক সিগারেট খেতেন বলে শুনিনি। একবার দুই জাঁদরেল সাংবাদিককে ক্রুদ্ধ ড: রায় তাঁর কামরা থেকে বার করে দিয়েছিলেন। ওঁদের একটি কথায় এত দূর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে "গেট-আউট, গেট-আউট" করতে করতে রাইটার্সের করিডর ছেড়ে সিঁড়ি অবধি বেরিয়ে এসেছিলেন। এই দুজন সাংবাদিকই এখনো জীবিত। তখন ওঁরা দুজনেই চীফ-রিপোর্টার। একজন আনন্দবাজারের, অপরজন যুগান্তরের। পরে এঁদের একজনকে নাকি টেলিফোন করে ড: রায় বলেছিলেন, "ওহে, তুমি যাচ্ছো তো?" অতুল্য ঘোষ ড: রায়ের এই মন্তব্যের যা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা হল, এই ভাবেই ড: রায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

অশোক সেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতের মানুষ। রাজনৈতিক নেতা আর ব্যারিস্টার অশোক সেনে অনেক ফারাক। বিধান রায় শ্যামাপ্রসাদ অথবা জ্যোতিবাবুকে কেউ দাদা বলেন না। কিন্তু রাজনৈতিক অশোক সেন তাঁকে অশোকদা বলতে আপত্তি করেন না। বরকতদা, প্রণবদা, সরোজদাদের মত তিনিও বহুজনের অশোকদা। ছেলের বয়সী তো বটেই, নাতির বয়সীও কেউ কেউ তাঁকে দাদা বলে থাকেন। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, বাইরেও। বাইরে অশোকদা নন, শুধু দাদা। তাঁর কক্ষই শুধু নয়, ন্যাশন্যাল কোর্টের গোটা ফ্ল্যাটটাই সকলের জন্য অবারিত দ্বার। শ্যামাপ্রসাদের বৈঠকখানাতেও যে কেউ ঢুকে পড়তে পারতো। কিন্তু অশোক সেনের কামরার মতন ঢুকে, একটি চেয়ার দখল করে "এই অজিত, চা নিয়ে আয়" বলা যেত বলে শুনিনি। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে সমানতালে মিশতে পারেন। পেশায় ব্যারিস্টার, সারা জীবন কথা বিক্রি করতে হয়েছে। স্মার্টনেস এখনো অটুট আছে। সেইজন্যই হয়ত দূরত্ব বজায় রাখার নীতিতে তাঁর আস্থা নেই।

সম্ভবত, সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশার এই নীতি তাঁকে সাহায্যও করেছে। সম্ভবত তিনিই একমাত্র এম. পি. যিনি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের প্রায় প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে পরিচিত। বাড়ির বাসিন্দাদের তিন পুরুষের নাম-ধামও বলে দিতে পারেন। বিশেষ করে তরুণদের ব্যাপকভাবে চেনেন। এবং সরস্বতী পুজো উদ্বোধন থেকে শুরু করে হরেক রকমের আব্দার হাসি মুখে মেনে নিতেই তিনি অভ্যস্ত।

ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়া অশোক সেনের আরো একটি বড় পুঁজি আছে। কংগ্রেস সংগঠনের বাইরেও তাঁর কিছু একনিষ্ঠ ভক্ত আছেন যাঁরা দাদার জন্য প্রাণ দিয়ে কাজ করেন। তাঁর নির্বাচনী কাজে যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মদন প্রামাণিক, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, পঙ্কজ চোঙদার এবং ধীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরি যিনি গোপালদা নামেই পরিচিত। সরকারি ভাবে দায়িত্ব না নিলেও দাদার সব কাজে নিজেদের জড়িয়ে রাখেন অজয় বসু, নান্টু চক্রবর্তী, রামদুলাল ঘোষ প্রমুখ দাদা-ভক্তেরা। দাদাগত প্রাণদের একজন ছিটকে বেরিয়ে গেছেন, আর একজন কাছে থেকেও নেই। দাদা নিরাসক্ত। যিনি বেরিয়ে গেছেন, তাঁর ডাকেও দাদা হাজির হন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ভক্তদের অন্যায় আবদার তাঁকে

টলাতে পারে না। '৮০-র নির্বাচনে এক ভক্ত বিধায়ক দাবী করেছিলেন নির্বাচন চালানোর পুরো দায়িত্ব তাঁকে দিতে হবে। দাদা রাজী হননি। তখন থেকেই দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক ছিন্ন। এবারের নির্বাচনে সম্ভবত এক গন্ডা বিধায়ক অশোক সেনের সঙ্গে কোনো রকমের সহযোগিতা করেননি। একজন বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এবং কয়েকটা ঘরোয়া মিটিংয়ে তাঁর অনুগতদের বলেছিলেন, "আর যাই করিস, দাদাকে ভোট দিস না।" এ সব অভিযোগ অশোক সেনের কানেও পৌঁছেছে। কিন্তু তিনি নিরাসক্ত। ছোট ভাইদের 'বাঁদরামি' তাঁকে টলাতে পারেনি। অতুল্য ঘোষের কলকাঠি নাড়ানো ঠিক – যেমন ডঃ রায়ের মনে আলোড়ন তুলতে পারতো না। সবসময় অতুল্যকে অতুল্য হিসেবেই দেখতেন সেই রকম অশোক সেনও তাঁর কক্ষচ্যুত তারকাদের ছোট ভাইয়ের মতই দেখেন। বয়স কিছু বেশী বলেই সম্ভবত শত্রু এবং মিত্রকে সমান চোখে দেখা যায়।

আমেরিকা থেকে ডঃ রায়কে ডেকে এনে মুখ্য (তখন প্রধান)মন্ত্রী মসনদে বসানো হয়েছিল। অশোক সেনের বেলাতেও প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছে। দেড় যুগ আগে মন্ত্রী ছিলেন। এতদিনে সে কথা হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন। চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছিলেন। এম. পি. ছিলেন ঠিকই, কিন্তু না ডাকলে আগ বাড়িয়ে রাজনীতিতে নাক গলাতেন না। এবার হঠাৎই তাঁকে কেন্দ্রের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে ডাকা হল। সেই অনুষ্ঠানে সবিস্ময়ে অশোক সেন দেখলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে প্রণব-গণি বাদ পড়েছেন। রাজীব মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবাংলার একমাত্র প্রতিনিধি তিনিই। এর আগে, কলকাতায় অধিবেশন এবং সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেস তাঁকে বড় দায়িত্ব দিয়েছিল। বহু তারকা খচিত অভার্থনা সমিতি এবং নির্বাচন কমিটির তিনিই ছিলেন প্রধান চেয়ারম্যান। এবার একমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে পুরো দায়িত্ব কি তাঁর উপর বর্তেছে?

অশোক সেন এ সম্পর্কে কিছু বলতে রাজি নন। তাঁর কাছের লোকজনদের ধারণা প্রণব-গণির গোষ্ঠী যুদ্ধে বিরক্ত রাজীব প্রদেশ কংগ্রেসকে অশোক সেনের হাতেই তুলে দিতে চান। তাঁকেই রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। কথাটা সত্যি কি না বুঝবার উপায় নেই, কারণ প্রণব-গণির মতন অশোক সেন এখনো কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটি অথবা পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য নন। তিনি শুধু আইন মন্ত্রী -- এই মন্ত্রক থেকে আবার কোম্পানী আইন ছাঁটাই হয়ে গেছে। সত্তরের

সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে অশোক সেনের তুলনা চলে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন একমাত্র বাঙালী পূর্ণমন্ত্রী। কংগ্রেসের সকল কমিটিতেও তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। তাঁর দীর্ঘদিনের জুনিয়ার সিদ্ধার্থ যে স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছিলেন, অশোক সেন এখনো তা পাননি। অনেকেরই আশংকা গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া হবে এবং এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি একদিন ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবেন।

কোনো র‍্যাডার দিয়েই রাজীবের মনের সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। রাশিয়া-আমেরিকাই পারছে না, রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের পক্ষেই বা তা কি করে সম্ভব হবে। কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না, রাজীবের মনে কী আছে এই রাজ্য তিনি কার হাতে তুলে দেবেন। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এখন তাঁর নেতাদের নির্বাচন করে না। এ দেশে এ কথা নতুন কিছু না। সুভাষচন্দ্রের মত নেতাও এ দেশে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, গান্ধীজীর আশীর্বাদ এবং দেশবন্ধুর শুভেচ্ছা পাওয়ার পর। পার্থক্য এটুকুই যে, হঠাৎ যিনি বিশ্বের সকল দেশের, সকল যুগের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দলের সর্বোচ্চ আসনে বসেছেন, তিনি একেবারেই নতুন, অভিজ্ঞতা একেবারেই শূন্য। হঠাৎ এতবড় দায়িত্ব, সুষ্ঠুভাবে তিনি কি করে পালন করছেন, তা এখনো রহস্যময়। কেউ বলতে পারছেন না যে তিনি পদে পদে ভুল করবেন না।

প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচিত নেতা না হলেও, নির্বাচিত কংগ্রেস এম. পিরা অশোক সেনকেই তাঁদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। নেতা হিসেবে তাঁর আর কোনো স্বীকৃতি নেই। বরং একজন আমলার চোখ দিয়ে দেখলে বলতে হবে, কংগ্রেস রাজনীতিতে ওয়ার্কিং কমিটি এবং পার্লামেন্টারি বোর্ডের দুই সদস্যের স্থান এখনো অশোক সেনের উপরে। এখন জানাজানি হয়ে গেছে যে, অশোক সেন তড়িঘড়ি প্রদেশ কংগ্রেস পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। যে কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নতুন রক্ত ইনজেক্ট করে, অশোক সেন তাকে সজীব করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রেসকৃপশানের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বরকত সাহেব। বলেছিলেন, সাত তাড়াতাড়ি কিছু করার দরকার নেই। বিধানসভাগুলোর নির্বাচন হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে।

অশোক সেন পুরোনো দিনের মানুষ, আগ বাড়িয়ে কিছু করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। যতটুকু দায়িত্ব পাবেন, ঠিক ততটুকুই তিনি করবেন। করেছেনও তাই। এম. পিদের নেতা হিসেবে তিনি প্রথম যে কাজটি করেছেন, তা দুহাত তুলে সাধুবাদ জানানোর মতই। রেলমন্ত্রী হয়েই বংশীলাল যে বাঁশী বাজানো শুরু করেন, তাতে এ রাজ্যের ছ-সাত হাজার পরিবারে আর্তনাদ উঠেছিল। রেলের ভলান্টিয়ার এবং ক্যাজুয়াল লেবারদের কাজের পুনর্বহালের দাবী তিনিই প্রথম উচ্চকণ্ঠে জানান। তিনি কলকাতায় ছিলেন বলেই, হঠাৎ কর্মচ্যুত রেলকর্মীরা রাজীব অথবা বংশীলাল বিরোধী ধ্বনি তোলেননি। মাদ্দার মত কোথাও ভাঙচুরও হয়নি। কংগ্রেস অফিসে বিক্ষুব্ধ বরখাস্ত কর্মীদের মাঝে যেতে অশোক সেন ভয় পাননি। নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে, তাদের সামনেই টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। রাজীবের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন যে কারো চাকরি যাবে না। সন্দেহ নেই যে অশোক সেনের সময়োচিত দৃঢ়তার জন্য এ রাজ্যের সাত হাজার ছেলের চাকরি কেউ খেতে পারেনি এবং রেল বোর্ডের বিতর্কিত চেয়ারম্যান রাঘবন আর এস্টেনশানও পাননি।

চাকরি ফিরিয়ে দেওয়াটাই অশোক সেনের কাছে বড় কথা নয়। প্রথম থেকেই তিনি বলে আসছিলেন, এঁদের চাকরিগুলো রেগুলারাইজ করতে হবে। অর্থাৎ, স্থায়ী চাকরি দিতে হবে যাতে আর কেউ কোনদিন এদের

বরখাস্ত না করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এ দাবি মেনে নিয়েছেন। বংশীলালের আর কোনো উপায় নেই। ইরেগুলার চাকরিগুলোকে রেগুলারাইজ করার ব্যাপারে তাঁ:ক কেন্দ্রের আইনমন্ত্রীর কাছেই আসতে হবে পথ বাতলাবার জন্য। বংশীলাল যে কলকাতায় এসে পাতাল রেল আর চক্র রেলের জন্য অনেক আশার কথা বলে গেলেন, তার পিছনে অশোক সেনের পরামর্শ আছে, এমন কথা অনেকেই মনে করছেন।

এম. পিদের নেতা হিসেবে অশোক সেন আর যে কটি পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার সবটাই তাঁর নিজস্ব চিন্তা-প্রসৃত। এ রাজ্যে কেন্দ্র যত কাজে হাত দিয়েছে, তার সবকিছুর খবরদারির দায়িত্ব নিয়েছেন এ রাজ্যের এম. পিরা। প্রতিটি মন্ত্রকের জন্য পৃথক কমিটি হয়েছে। এই কমিটিগুলো যার যার মন্ত্রকের সকল কাজের উপর নজর রাখবে। আপাতত মুখ্য কাজ দুটি। এক, রুগ্ন কল-কারখানা খুলে দেওয়া, দুই, উদ্বাস্তুদের হাতে জবরদখল কলোনিগুলোর লীজ-দলিল অর্পণ।

রুগ্ন শিল্প খোলা সহজ ব্যাপার নয়। অনেকের মতে ব্যাপারটা ভাড়াটে সমেত পুরাতন বাড়ি কেনার মত। যে কারখানার তিনশ লোক দরকার, সেখানে তিন হাজার লোককে কাজ দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ তো আছেই, মালিকেরাও কম দোহন করেননি। সব পাপ থেকে মুক্ত করে কারখানাগুলো চালু করা, তাদের লাভজনক করা, কর্মচারীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা এসব বড় সোজা ব্যাপার নয়। ইতিমধ্যেই অশোক সেনের কাছে এঞ্জেলো ব্রাদার্স প্রভৃতি কারখানার বেকার কর্মচারীরা যাতায়াত শুরু করেছেন। রুগ্ন কারখানা খোলার ব্যাপারে কেন্দ্র অনেক দূরে, কর্মীরা কিন্তু কাছের মানুষ অশোক সেনের দিকেই তাকিয়ে আছে। আর কিছু না পারুন, সপ্তাহে দুটো দিন এবং দুটো রাত্রি তিনি কলকাতাতেই কাটাচ্ছেন। □

প্রদেশ কংগ্রেসের মহাকাশে নতুন জ্যোতিষ্ক

বিশেষ সংবাদদাতা

নির্বাচনের ফাইনাল ম্যাচে আশাতীত ভালো খেলেও পরাজিত কংগ্রেস সন্তানে সারারাজ্যে বিজয়োৎসবের বান ডাকিয়েছিল। কয়েকটা দিন সাড়ম্বর ধূমধামের পরেই মনে হল কংগ্রেস ঘুমিয়ে পড়েছে। হাজি মহসিন রোডের দেশলাইয়ের বাক্সের মতন অফিসটি ঝিমিয়ে পড়লেই গোটা রাজ্যে কংগ্রেস ঘুমিয়ে পড়ে। এ ঘুম রিপ ভ্যান উইংকিলের ঘুম থেকেও প্রগাঢ়। ঘুম ভাঙগানোর চাবিকাঠি এ রাজ্যে কারো হাতে নেই। সেটি দিল্লিতে সযত্নে রক্ষিত। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

প্রণব-গণি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়লে এই কংগ্রেসী নিদ্রা প্রগাঢ়তর হয়। কর্মচ্যুত সাত হাজার রেল কর্মীকে বাহাদুরি দিতে হবে এই জন্য যে তাঁরা চেল্লাচেল্লি আর ঠেলাঠেলি করে মহসিন স্কোয়্যারের মহানিদ্রা ভাঙগতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের সমাবেশে দীর্ঘদেহ অশোক সেনকে দেখে মনে হয়েছিল যে এতদিনে প্রদেশ কংগ্রেস বুঝি

একজন ত্রাণকর্তাকে পেয়েছে। এ রাজ্যে কংগ্রেসের সবকিছুই আছে। প্রতিপক্ষের অখ্যাতি ও কুখ্যাতি -- এই সব কিছুকে বিরাট কিছুতে রূপান্তরিত করেছে। কয়েক ডজন শাখা সংগঠন তো আছেই; কংগ্রেস দলের সঙ্গে কস্মিনকালেও সম্পর্ক নেই এমন বহু সংগঠন এখন প্রাণের দায়ে কংগ্রেসীদের চেয়েও বেশি কংগ্রেস-ভক্ত। সরকারি কর্মচারি এবং পুলিস সংগঠনগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

এ রাজ্যে কংগ্রেসের নেই শুধু একটি বস্তু। না, নেতার অভাব নয়। বরং জেতার আধিক্যই কংগ্রেসের ক্রনিক ব্যাধি। অভাব শুধু সকল গোষ্ঠীর উর্ধ্বে, সর্বজনস্বীকৃত একজন নেতার। কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে অশোক সেনকে দেখে আশার সঞ্চার হয়েছিল। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, কংগ্রেসের মহাকাশে এতদিনে একজন সূর্যকে পাওয়া গেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের ডি-ফ্যাকটো জোতিষ্কের ভূমিকায় অশোক

সেনকে কয়েকদিন দেখাও গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। সেই ঝিমিয়ে পড়া। তারপর নিদ্রা থেকে মহানিদ্রা। জানা গেল কক্ষচ্যুত তারকা আবু বরকত আতাউল গনি খান আবার তাঁর কক্ষপথে এসে গেছেন। তাঁর চিৎকারে রুগ্ন এবং পঙগু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি অক্সিজেন ছাড়াই পুনর্জন্ম লাভ করেছে।

এদিকে অশোক সেন তাঁর ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের একটি নতুন কমিটি এখন তাঁর পকেটে। আজকের মিলিয়ান ডলার প্রশ্ন হল: রাজীব কবে এই কমিটির অনুমোদন করবেন? পাকা কথা না পেয়ে অশোক সেন কমিটি গঠন করেছেন বলে মনে করার কোনো হেতু নেই। তিনি কখনই এত কাঁচা কাজ করবেন বলে মনে হয় না।

জানা গেছে যে তাঁর কমিটিতে কংগ্রেসের সভাপতি অশোক সেন নিজেই। এই ব্যবস্থায়, ধরে নেওয়া যেতে পারে, হাই কম্যান্ডের সম্মতি আছে। দ্বৈত দায়িত্ব অর্পণ কংগ্রেসের রীতি-বিরুদ্ধ। রাজীবের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান হলে সেই ব্যতিক্রমই ঘটবে। রাজীবের সায় না থাকলে সেটি সম্ভব নয়।

অশোক সেনের নিচে কার্যকরী সভাপতি হবার কথা অজিত পাঁজার। সম্পাদকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম সাড়া জাগাতে পারে। সোমেন মিত্র, নুরুল ইসলাম, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। নাম আছে সন্তোষ রায় এবং ডঃ মোতাহার হোসেনেরও।

অশোক সেন দায়িত্ব পেলে আরও বড় রকমের পরিবর্তন ঘটবে জেলা এবং ব্লক কংগ্রেস কমিটিগুলোতে। যেমন দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হবেন পঙ্কজ ব্যানার্জি। জোড়াসাঁকোর বিধায়ক সুব্রত মুখার্জিকে পার্লামেন্টারি রাজনীতি এবং শ্রমিক রাজনীতির মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হবে। পঙ্কজ ব্যানার্জির মতো নেতাদের খুঁজে বার করতে কয়েকজনকে বলা হয়েছে। আরও অনেক জেলা এবং ব্লকে চমক সৃষ্টির ইচ্ছা আছে

অশোক সেনের। ছাত্র-পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসকেও তিনি ঢেলে সাজাতে চান।

শেষ পর্যন্ত অশোক সেনের স্বপ্ন সফল হবে কিনা তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। ইতিমধ্যেই তাঁর তড়িঘড়ি প্রদেশ কংগ্রেস পুনর্গঠনের সদিচ্ছা বানচাল হয়েছে বরকত সাহেবের বাধা দানের ফলে। বরকতের মনে কি আছে এবং রাজীব এই রাজ্যের ক্ষেত্রে তাঁকে কতটুকু ক্ষমতা দেবেন তার উপরেই নির্ভর করছে প্রদেশ কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ। □

বিশ্বব্যাংকের ১১০ কোটি টাকার প্রকল্প হাত ছাড়া?

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গে সর্বব্যাপী চিকিৎসা ব্যবস্থার বিপর্যয়ের মধ্যে কিছুটা আশার বাণী বয়ে নিয়ে আসছে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের অনুমোদিত ১১০ কোটী টাকা ব্যয়ের "৪র্থ ভারতীয় জনসংখ্যা প্রকল্প।"

বিশ্বব্যাংক পরিকল্পিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং ন্যূনতম চিকিৎসা সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে গ্রামস্তর পর্যন্ত। উচ্চতর পর্যায়ে মহকুমা এবং শহরগুলোতে হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও কেন্দ্রীয়ভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সেবিকা এবং কর্মীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

১ জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু হবার কথা ছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের ঢিলেমিতে এখনো পর্যন্ত পরিকল্পনা তৈরির সংগঠনটিও গড়ে ওঠেনি। কাজ কবে আরম্ভ হবে সে বিষয়েও গভীর অনিশ্চয়তা। অথচ এই গাফিলতির ফলে চার বছরের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে কাজ শেষ না হলে প্রকল্প অর্ধ সমাপ্ত থাকবে বরাদ্দ অর্থ খরচ না হলে অর্থ ফেরত যেতে পারে।

রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে বর্তমান অর্থ হাহাকারের মধ্যে অন্য সংস্থান থেকে যে টুকু টাকাও আসছে তাও পরিকল্পনা মাফিক ব্যয় করার উৎসাহ সরকারের নেই। প্রশাসনের এই স্থবিরত্ব রাজ্যকে দেউলিয়া করে তুলছে।

বিশ্বব্যাংকের এই পরিকল্পনা নতুন নয়। উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। কর্ণাটক এবং কেরালার কয়েকটি অঞ্চলে প্রথম পর্যায়ের কাজ এখন চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি জেলায় এই কাজ শুরু করার কথা ছিল। জেলাগুলো হলো পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া। তবে প্রথম পর্যায়ে জেলাগুলোর সংখ্যা কমানো হয়েছে ছ'টী থেকে দু'টোতে। এ পর্যায়ের কাজের সাফল্যের পরে পরবর্তী জেলাগুলো গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের এই প্রকল্পের কাজ গুলোকে ছ'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অংশে পাঁচটি গ্রামকে ঘিরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার কথা বলা হয়েছে। এই কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত থাকবে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাত্রী। তাঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজখবর নেবে স্বাস্থ্য বিষয়ে এবং ধাত্রীরা সন্তান প্রসবে মায়েদের সাহায্য করবে। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তারা জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করবে ও সন্তানসম্ভবা মেয়েদের দেখাশুনা করবে। উপমহাদেশে জনসংখ্যা হ্রাসে সাহায্য করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় কাজ চালাবার জন্যে নতুন বাড়ি তৈরি হবে। কর্মীদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থাও থাকবে।

বাইরে থেকে মাঝে মাঝে পরিদর্শনরতা সেবিকারা গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশে বর্তমান "সাবসিডিয়ারি" স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে যেখানে ৪টি শয্যা আছে সেখানে তা বাড়িয়ে ৬টিশয্যায় সম্প্রসারিত করা হবে। নতুন পরিকল্পনায় রোগিদের পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে তা নেই। এর সাথে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অপরাশেন ঘর, প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, ঔষধপত্র রাখার ঘর প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে।

পরিকল্পনার তৃতীয় অংশ অনুসারে বর্তমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে প্রসব ঘরকে সম্প্রসারিত করা হবে। এক্স-রে ব্যবস্থা চালু হবে। এবং বর্তমান শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হবে। এর মধ্যে থাকবে এক্স-রে ব্যবস্থা, অপারেশন ঘর, ওয়ার্ড ঘর ইত্যাদি।

হাসপাতাল পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক এবং কর্মীর ব্যবস্থাও করা হবে।

বর্তমান "কমিউনিটি" স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকেও সম্প্রসারিত করা হবে।

পরিকল্পনার পঞ্চম অংশে প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দু'টি করে নতুন ইউনিট যুক্ত করা হবে। প্রথম ইউনিটের কাজ হবে সাধারণ মানুষকে পরিবার কল্যাণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা এবং জন্মনিরোধ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া। দ্বিতীয় ইউনিটে, শিশুদের চিকিৎসা সম্বন্ধে পুরো ব্যবস্থা থাকবে। ষষ্ঠ ও শেষ অংশে কলকাতার সল্টলেকে "এপেক্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্রীয় ভাবে এখানে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে কাজ করার জন্যে সেবিকা এবং কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানের পরিধি খুবই ব্যাপক হবে এবং মাঝে মাঝে দেশের বাইরে থেকেও বিশেষজ্ঞদের এনেও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রাথমিক পরিকল্পনা খুবই বিস্তৃত ছিল তার ফলে গোড়ার দিকে কাজের হিসেব ধরা হয়--২৯২ কোটি টাকা। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে সে টাকা কমিয়ে ১৩০ কোটি টাকায় নামানো হয়। দু'মাস আগে যখন কাজের স্বীকৃতি এলো, তখন দেখা গেল তা আরও ২০ কোটি টাকা কমে ১১০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সেই অনুসারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে কাজ হবে ৬৫ কোটি টাকা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যায় হবে ৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাড়ি তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট কাজের পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ। এ টাকার শতকরা ৫০ ভাগ দেবে বিশ্বব্যাংক "মৃদু" ঋণের মাধ্যমে যা শতকরা ৩ ভাগ সুদে ৪০ বছরে শোধ করতে হবে। বাকি টাকা আসবে-শতকরা ৭০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এবং ৩০ ভাগ দেবে রাজ্য সরকার।

বর্তমানে একাজ করার জন্য সমস্যা যা দাঁড়িয়েছে তা হলো পূর্ত বিভাগের সঙ্গে স্বাস্থ্য-বিভাগের নানা টানা-পোড়েন। স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী এবং আই-এ-এস অফিসার পরিচালিত প্রশাসনের গোড়া থেকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কি করে এ কাজের পুরো স্বামিত্ব স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনেই রাখা যায়। কারণ পরিকল্পনার অর্থের সিংহ ভাগ শতকরা ৬০ ভাগ যদি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে হয়, তা হলে কি করে রাজনৈতিক নিয়োগগুলো নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়।

তাই স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট জয়েন্ট সেক্রেটারী দাবী করে আসছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ দেখাশুনোর জন্যে একজন সপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ারকে ভার দেওয়া হোক। তাঁরা আরো চাইছেন যে সে ইঞ্জিনিয়ার এবং তার সংগঠন পুরোপুরি স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে থাকবে।

কিন্তু এতে বাধ সাধলেন বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষ। মিঃ প্যাট ওয়াকার গত ৯ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর বিশ্বব্যাংকের ৬-সদস্যের টীম নিয়ে কলকাতায় বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এত কোটি টাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করার জন্যে পুরোপুরি এমন সংগঠন প্রয়োজন যার নেতৃত্বে থাকবে·দু'জন চীফ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পরিকল্পনা ও কাজের তদারকির জন্যে দু'টো আলাদা বিভাগের প্রস্তাব করেছেন। চীফ ইঞ্জিনিয়ারদের অধীনে থাকবে বেশ কয়েক জন অধঃস্তন ইঞ্জিনীয়ার। যুক্তি হিসেবে জানিয়েছেন, চার বছরে এত বিপুল পরিমাণ অর্থের কাজ করতে হলে পূর্ণাঙ্গ সংগঠন প্রয়োজন।

এ প্রস্তাব স্বাস্থ্য দপ্তরের মনঃপূত নয়। কারণ জয়েন্ট সেক্রেটারির অধীনে কোন চীফ ইঞ্জিনিয়ার রাখা সম্ভব নয়। তাই চীফ ইঞ্জিনিয়ারদের নেতৃত্বে সংগঠন তৈরি হ'লে তা চলে যাবে স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে। একজন সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার থাকলে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে রেখে ইচ্ছে মতো নয়-ছয় করার সুযোগ হতো।

যেহেতু এখন বিশ্বব্যাংকের সম্মতি জ্ঞাপক নোটে আপাততঃ একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে ৩৫ জন অধঃস্তন ইঞ্জিনীয়ার এবং স্থপতি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে, তখনই স্বাস্থ্য দপ্তরে নানা গড়িমসি শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ তাঁরা জানেন এ ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক প্রভাব রক্ষা করা এবং স্বজন প্রীতি প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে এ সংগঠন তৈরি হলে দূর থেকে কোন প্রভাব সেখানে খাটানো যাবে না।

এ বিষয়ে আমরা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারদের সংস্থা ফোরাম অব প্রফেশনাল এর আহ্বায়ক সি আর দত্তের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম। কারণ এ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের প্রযুক্তিবিদদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনমুখী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির জন্যে আন্দোলন করছেন।

শ্রী দত্ত বিশ্বব্যাংকের এ প্রকল্প সম্বন্ধে সরকার পক্ষ থেকে যে টালবাহানা হচ্ছে তার জন্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, স্বাস্থ্য দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশাক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে, যদি কোন ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা চিন্তা করেন, সেটা খুবই দুর্ভাগ্য জনক হবে। তিনি আরো বলেন, বিশ্বব্যাংকের স্বীকৃতি আসা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত পরিল্পনা তৈরির সংগঠন গড়ে উঠলো না যা জানুয়ারিতে তৈরি হওয়ার কথা। জুলাই মাস থেকে কাজ শুরু করার "টার্গেট" ও শেষ পর্যন্ত রাখা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

শ্রী দত্ত বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের গাফিলতীর ফলে এ প্রকল্প যদি সু-সমাধা না হয়, তার দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে।□

হকার উচ্ছেদে সরকার মরীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতার পঞ্চাশ হাজার হকারদের উপর এখন খড়্গ ঝুলছে। উচ্ছেদ করবই ঃ সরকার সংকল্পে অটল। চূড়ান্তভাবে উৎখাত করার আগে শুরু হয়েছে যতরকমে সম্ভব যন্ত্রণা দেওয়া, উত্যক্ত করা।

ইতিমধ্যে পুলিশ দিয়ে হাজার কয়েক হকার তুলে দেওয়া হয়েছে। অননুমোদিত স্টল ভেঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা পুলিশের সঙ্গেই চোর পুলিশ খেলছেন। হল্লা আসতেই সবাই মালপত্র নিয়ে পালাচ্ছেন। পুলিশের মনোভাব, নিঃসন্দেহে উপরের নির্দেশে, অনেক কঠোর হয়েছে। সর্বত্র চলছে এলোপাথারি হকার উচ্ছেদ। স্টল ভাঙ্গা, মালপত্র আটক এবং গ্রেপ্তার। গড়ে প্রতিদিন শ পাঁচেক হকার গ্রেপ্তার হচ্ছেন। অনেক থানা ৫০ জন হকারও আটক করেছে। সকাল আটটায় ধরে রাত আটটা-নটায় জামিন দেওয়া হচ্ছে। পনের থেকে তিরিশ টাকা জামিন দিয়ে মুক্তি কেনা যাচ্ছে। ফলে একটি দিনের কারবার বন্ধ।

শিয়ালদহে হকার উচ্ছেদ

হাইকোর্টের বিধি মুহুরিদের জামিনে দাঁড়ানোর অধিকার দেয়নি। থানাগুলোতে বড়বাবুদের পেটোয়া কিছু মুহুরিদের দেখা যাবে অষ্টপ্রহর। এঁদের কেউ কেউ দুটো কাজই করেন। ধরিয়ে দেন আবার জামিন করিয়েও দেন। বরের ঘরে মাসি, কনের ঘরের পিসি এঁরা। আদালতে জরিমানা হয় খুব বেশি হলে পাঁচ টাকা -- বড় জোর দশ টাকা। কিন্তু জামিনের জন্য প্রণামী দিতে হয় পনের থেকে তিরিশ টাকা। আটক মালের দিকে চোখ রেখে হাকিমরা জরিমানা ধার্য করেন। পুলিশের খাতায় রেডিমেট জামা-কাপড়কে চিনে বাদামে পরিণত করার কৌশল এই মুহুরিরা জানেন। হকারদের যখন সর্বনাশ, এঁদের তখন পৌষ মাস। দিয়ে-থুয়ে এঁদের আয় ভালই হচ্ছে।

আজ যে পুলিশ দিয়ে হকারদের উচ্ছেদ

করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কিছু দিন আগেও হকারদের নিদারুণ দোস্তি ছিল। হকার হিসেবে যে কোন জায়গায় বসতে গেলেই কম করে একশত টাকা দিতে হত সার্ভিস সেলামি। তেমন, সরেস জায়গা হলে আড়াই শত টাকা। তারপর জমাদার ঘাঁটি। আটজনকে পাঁচ টাকা করে। নিত্যকার জন্য আছে সেপাই ঘাঁটি। সকাল-সন্ধ্যাতে দুবার। ৬০ পয়সা করে। এ ব্যবস্থা এখনও অটুট আছে। শুধু হকার নয়, হকার ইউনিয়নগুলোর উপরও হুকুম চালাতেন বড়বাবু মেজবাবুরা। বড়-মেজবাবুদের মন না পেলে হকারদের নেতা হওয়া যেত না। এখন উচ্ছেদ চললেও বাবুদের আয় কমে নি।

অথচ ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা বারবার কথা দিয়েছিলেন, ১৯৭৭-এর আগে যাঁরা হকার ছিলেন, তাঁদের কোন অবস্থাতেই উচ্ছেদ করা হবে না। এখন অতীতের কোন প্রতিশ্রুতিরই কোন মূল্য থাকছে না। পুলিশ যাঁকে খুশি উৎখাত করছে।

এই ব্যাপারেও পছন্দ-অপছন্দর কথা উঠেছে। উলটাডাঙা, গড়িয়াহাটা, শেয়ালদা, হাওড়া সেতু প্রভৃতি স্থানে আনাজ বিক্রেতাদের গায়ে আঁচড় পড়ছে না। সিটু ইউনিয়নের প্রভাব যেখানে বেশি, যেমন ব্র্যাবোর্ন রোড ও ডালহৌসী চত্বর, সেখানে হকারদের বহাল তবিয়তে রাখা হচ্ছে। পুলিশের কোপ বিশেষ করে সোমেন মিত্রের হকার্স কংগ্রেসের উপরেই বেশি পড়ছে।

বাধ্য হয়েই ওঁরা আন্দোলনের পথ ধরছেন। শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন যাবে। হকার্স কংগ্রেসের সেক্রেটারি মনোতোষ রায় বললেন, দ্বিতীয় হুগলি সেতু, শেয়ালদার নতুন বাজার, সত্যনারায়ণ পার্ক,

খোদ মহাকরণের পাশে হকাররা (বি.বি.ডি.বাগ)।

ব্র্যাবোর্ন রোডের উড়াল পুলের নিচে -- এরকম কয়েকটি স্থানের কথা ওঁরা বলবেন, যেখানে এখনও বহু হকার বসানো যায়। ডেপুটেশনে সোমেন মিত্র ছাড়া কলকাতার সকল কংগ্রেসি বিধায়ক এবং এম. পিদের যাবার কথা আছে। অশোক সেনের থাকবার প্রশ্ন ওঠে না। তবে ভোলানাথ সেন, অজিত পাঁজা প্রমুখ থাকবেন। ওঁরা বলবেন, আপনি কথা দিয়েছিলেন, "৭৭-এর আগের হকারদের উচ্ছেদ করা হবে না। আপনার কথা মত পুলিশ ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ছিল। ঠিক হয়েছিল, হকাররা বড় বড় মোড়ের ৫০ ফুটের মধ্যে বসবে না। এখন অনেক জায়গায় বিকিকিনি করলেও তোলা হচ্ছে না, অন্য

জায়গায় মোড় থেকে বহু দূরে থাকলেও পুলিশ দূর দূর করে হটিয়ে দিচ্ছে। পুলিশ আটক মাল ফেরৎ দিচ্ছে না, অনেক জায়গায় লাঠিচার্জ করছে। গ্রেপ্তার হবার পর হকারদের থানাতে অহেতুক আট-দশ ঘন্টা আটক রাখা হচ্ছে।

সকল ক্ষেত্রে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই বলা হবে। নেতারা বলবেন, হকার উচ্ছেদের ব্যাপারে সরকার সুস্পষ্ট একটা নীতি ঘোষণা করুন। নতুন যে জায়গাগুলো তৈরি হচ্ছে, সেখানে সত্যিকারের হকারদের পুনর্বাসন দিতে হবে। সবশেষে বলবেন, এ দাবি না মানলে আমরা কিন্তু আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। □

দত্তাবাদের দুঃখ

নিজস্ব প্রতিনিধি

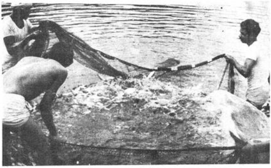

মাছ-চাষই দত্তাবাদের মানুষের প্রধান জীবিকা।

দত্তাবাদের দুঃখের পরিধি বেড়েই চলেছে। লবণ হ্রদের প্রবেশপথের "অবৈধ" পাঁচশতটি ঘর নিয়ে এই দত্তাবাদ। অননুমোদিত, জবরদখল, অবৈধ প্রভৃতি যে বিশেষণেই ভূষিত করুন না কেন, এই পাঁচশত বাড়ির আড়াই হাজার বাসিন্দা দাবি করেন যে, মহানগরীর আদি বাসিন্দা তাঁরাই। জোব চার্ণকের আগমনের আগেই তাঁদের পূর্বপুরুষেরা কলকাতার উপকণ্ঠে স্থায়ীভাবে এসে গেছেন। চারশত বছরেরও অধিককাল যাঁরা ওই এলাকায় আছেন, তাঁদের ভিটেছাড়া করার ব্যবস্থা প্রায় পাকা।

ওঁদের দখলে আছে মোট দুশত একর জমি সরকার যার দখল পেলে লবণ হ্রদ প্রকল্প আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে। ওঁরা ধারে-কাছে মাথা পিছু দু কাঠা করে জমি চান। অমনিতে নয়, সরকার নির্ধারিত ন্যায্য দামে। ওঁদের দাবি মেনে নিলেই সরকারের হাতে দু শত একর জমি এসে যায়।

সরকার ওঁদের তুলে দিতে চান। লবণ হ্রদের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে। ওঁদের অন্য কথা। জাতির স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে আমরা উঠেছি। স্টেডিয়াম তৈরির আগে আমাদের দুবার বলতে হয়নি। এখন পুলিশ লেলিয়ে জোর করে উচ্ছেদ করতে গেলে আমরা প্রতিরোধ করব।

লবণ হ্রদ প্রকল্পের পক্ষে ডি পি চ্যাটার্জি ওঁদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন/বলেছিলেন, একুশ একর জমির একটি প্লট পৃথক করে রাখা আছে। তার থেকে কুড়ি একর দেওয়া কঠিন কিছু হবে না। জমিটা মানিকতলা মেন রোড আর কাদাপাড়া মেন রোডের মোড়ে। দত্তাবাদীদেরও জায়গাটা পছন্দসই। কাছেই। উঠে যেতে অসুবিধে হয় না। কথা ছিল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্ল্যানও করে দেবেন। দত্তাবাদ উচ্ছেদ সংরক্ষণ সমিতির নেতারা এই জমিটুকু ন্যায্য দামে কিনবার দাবি নিয়ে বারবার পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের সঙ্গে দেখা করেছেন। সমিতির সভাপতি অপূর্বলাল মজুমদার, সোমেন মিত্র, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, বীরেন মহান্তি ছাড়াও নরেন বর, পরেশ পাল প্রমুখ বারবার ধর্ণা দিয়েছেন। পরেশবাবুর বক্তব্যঃ প্রশান্ত শূর এখন "দেখছি, দেখব" করছেন।

এই মাসেই উচ্ছেদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। আশুতোষ লাহা, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, অজিত পাঁজা, জয়া পাঁজা, সোমেন মিত্র, সুবিমল মিত্র, পরেশ পাল প্রমুখ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন। পরেশ বললেন, উচ্ছেদ প্রতিরোধ করবই। সরকার চাইলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারেন। আমাদের টলানো যাবে না।

প্রতিরোধ নতুন কিছু নয়। নরেন বর এবং তাঁর ভাই চণ্ডী বরকে পুলিশ কয়েকবারই গ্রেপ্তার করেছে। লাঠিপেটাও করেছে কয়েকবার। জাল কাঁধে নিয়ে দত্তাবাদীরা এসপ্লানেড ইসট-এ ধর্ণা দিয়েছেন। পাঁচশত মহিলা সত্যাগ্রহী অনশন ধর্মঘট করেছেন। প্রশান্ত শূর দাঁড়িয়ে থেকে বুলডোজার চালিয়ে দত্তাবাদীদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছেন। ওঁরা আবার ঘর বেঁধেছেন। দাবি না মানলে এবার আন্দোলন হবে আরও জোরদার। □

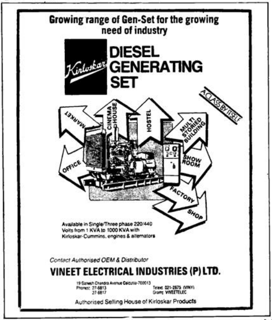

একটি বিজয়ীর রূপ রেখা ঃ জুড

ভবেন ঘোষ

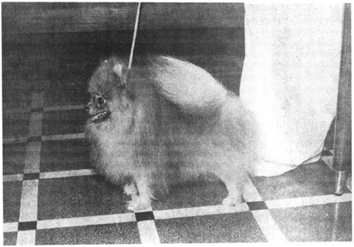

ভারতের সব সারামেয়-প্রেমিকদের দৃষ্টি এখন জুডের ওপর। কারণ, জুড (Jude) সম্ভবতঃ 'বছরের সেরা সারমেয়' (Dog of the year) খেতাব অর্জন করতে চলেছে। এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সারমেয় প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতার ফলাফলের গতিপ্রকৃতি দেখে অন্তত তাই মনে হয়। যদি তাই হয়, তবে জুড 'হিন্দু পারিতোষিক' (Hindu Trophy) পাবে। এটা এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সারমেয় সংঘ (Kennel Club) আছে। এদের শীর্ষে আছে ভারতীয় সারমেয় সংঘ (Kennel Club of India বা কে সি আই)। এই সংস্থার দফতর তামিলনাড়ুর কুন্নুর সহরে। ভারতের সব সারমেয় প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতা এই শীর্ষ সংঘের নিয়ম কানুন অনুসারেঅনুষ্ঠিত হয়। জাতিগত বিচারে সেরা সারমেয়কে সাধারণতঃ চ্যালেঞ্জ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যে কুকুর তিনটি প্রদর্শনীতে তিনজন ভিন্ন বিচারকের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ সার্টিফিকেট পায় তাকে 'চ্যাম্পিয়ন' বা সেরা প্রতিযোগী বলা হয়। জাতিগত এবং শ্রেণীগত বিচারে সেরা সারমেয়কে 'প্রদর্শনীর সেরা সারমেয়' (Best Exhibit in Show) উপাধি দেওয়া হয়। এ সম্মান খুবই দুর্লভ। জুড এখন পর্যন্ত এ সম্মান পেয়েছে আটবার।

বার মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে যে সব সারমেয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাতে যে কুকুর সর্বাধিক পয়েনট পায় তাকে বলা হয় 'বছরের সেরা সারমেয়'। বছর-মে থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। এই পারিতোষিক দেন মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার পরিচালক শ্রী এস নাগরাজন।

সারমেয় প্রদর্শনীর সেরা প্রতিযোগী পায় দশ পয়েনট।দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগী পায় সাত, তৃতীয় সেরা পায় পাঁচ ও চতুর্থ সেরা পায় তিনপয়েনট। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা সারমেয় সংঘ (Calcutta Kennel Club বা সি কে সি)-এর শততম প্রদর্শনী পর্যন্ত জুড পেয়েছে চুরাশি পয়েনট। তখন পর্যন্ত, হিন্দু পারিতোষিকের দাবিদারদের মধ্যে, জুডের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল একটি ডবারমান কুকুর, নাম আর্গাস। সে পেয়েছে সত্তর পয়েনট। আর্গাসের মালিক অওওয়ার রাজা গজেন্দ্র সিং, থাকেন বাঙগালোরে।

জুডের কৃতিত্ব চমকপ্রদ। সে জীবনে প্রথম সেরা সারমেয়ের সম্মান অর্জন করেছিল বম্বের প্রদর্শনীতে, ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তারপর, পরপর সাতবার এ সম্মান পায় জুড। আজ পর্যন্ত কলকাতার কোন কুকুর আটবার সেরা প্রতিযোগীর সম্মান পায়নি। এটাই জুডের বাহাদুরী। ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে ক্যালকাটা কেইনাইন ক্লাব ও কে সি আই মিলিতভাবে জোড়া প্রদর্শনী (Twin Show)-এর আয়োজন করে। দুটিতেই জুড সেরা সম্মান পায়। বিশ্বের সেরা বিচারকদের একজন অস্ট্রেলিয়ার মিস্টার ডবল্যু জি স্পিলস্টেড। তিনি বলেছিলেন যে, জুড যে কোন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে জিততে পারে। ১৯৮৪-র ডিসেম্বর কানপুরেরপ্রদর্শনীতে আমার সেরা সম্মান লাভ। পুরস্কার -- সোনারকাপ (Singhania Cup) ও নগদ তিন হাজার টাকা। ডিসেম্বরেই লখনউতে তিনটি প্রদর্শনী হয়, পরপর। লখনউ সারমেয় সংঘ, উত্তর প্রদেশ সারমেয় সংঘ ও আউধ সারমেয় সংঘ – তিনটিতেই জুড প্রদর্শনীর সেরা সারমেয়। এ বছরের জানুয়ারী মাসে চণ্ডীগড়ে ট্রাইস্টার সারমেয় সংঘের প্রদর্শনী

হয় তাতেও জুড সেরা। চণ্ডীগড়ের আর দিল্লী, জানুয়ারী মাসেই। সে প্রদর্শনীতে জুড বিবেচিত হল দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগী ফেব্রুয়ারীতে সি কে সির শততম প্রদর্শনীতেও জুড হল দ্বিতীয়। এই লেখার সময় জুড পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। আবার জয়যাত্রায় বেরিয়েছে।

জুডের কেনেল নাম বা পোষাকী নাম চাঃ (চ্যাম্পিয়ন) প্যাডকউড ফ্রেন্ডলীম্যান। তবে 'জুড' বললেই ওকে সবাই চেনে। জুড পমেরানিয়ান জাতের কুকুর। সংক্ষেপে 'পম'। আদিমকাল থেকে বাসস্থান জার্মানীর পমেরানিয়া অঞ্চলে। এরা স্পিৎস (Spits) শ্রেণীর কুকুর। এককালে পমেরানিয়ান আকারে অনেক বড় ছিল। ওজন পঁচিশ পাউন্ড (দশ কিলোগ্রাম)। তখন এদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেওয়া হত (Working Dog)। পরে এদের সাদরে পোষা খেলনা (Toy) কুকুরে পরিণত করা হয়, ওজন কমে হয় পাঁচ পাউন্ড (দুই কিলোগ্রাম)। পমেরানিয়ান ইংলন্ডে আসে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ও রাণী ভিক্টোরিয়ার পৃষ্ঠপোষকতার সৌভাগ্য অর্জন করে ১৮৮৮ সালে।

১৯৮১ সালের পয়লা জুন জুডের জন্ম ইংলন্ডের উত্তর ডেভনে। বাবা ইংলন্ড চ্যাম্পিয়ন ম্যাডলে সামার লাইটনিং ও মা প্যাডকউড ফায়ারডান্স এ পরিবারের অনেকেই ইংলন্ড, আমেরিকা ও জাপানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শিশু জুড ইংলন্ডে থাকতেই কয়েকটি প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছিল। ভারতবর্ষে যখন আসে তখন ওর বয়স ছিল এগার মাস।

কথা হচ্ছিল তপন চক্রবর্তীর সঙ্গে। ওঁর মা শ্রীমতী ইলা চক্রবর্তী ১৯৭৫ সাল থেকে পমেরানিয়ান পুষছেন। দুটোছেলে-কুকুর আনেন ইংলন্ড থেকে ও একটি মেয়ে-কুকুর অস্ট্রেলিয়া থেকে। পমেরানিয়ানের বাচ্চা একবারে সাধারণত দুটোর বেশি হয়না। ভাল বংশ (Pedigree)-এর বাচ্চা পনেরশো থেকে দু হাজার টাকায় পাওয়া যায়। তপনবাবু বললেন, 'বাচ্চা হবার পর মা বলেছে, 'এটা দেখতে বেশ হয়েছে, একে রেখে দেব'। তাই, বিরাট পরিবার। তার সাতজন সদস্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং এদের বংশধররা মাদ্রাজ, বম্বে, দিল্লীতে বিজয়ী হয়েছে।

জুড সকালে ও বিকেলে খায় একখানা করে বিস্কুট। দুপুরে খায় পঞ্চাশ গ্রাম মেটে ও কিমা। রাতেও তাই। আগে কিমার সঙ্গে কয়েক টুকরো হাতে গড়া রুটি খেত। এখন রুটি বড় একটা খায় না। ছোট শরীর বলে, ব্যায়াম হিসেবে, বাড়ীর মধ্যে ঘোরা ফেরা বা ওপর নিচ করাই যথেষ্ট। অবশ্য, প্রদর্শনীর আগে রোজ সকালে বড় রাস্তার ফুটপাথে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। বলরাম বোস স্ট্রীট থেকে বিবেকানন্দ রোডে। জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। তাতে মেজাজ ঠিক থাকে এবং প্রদর্শনীর সময় জন সমাগম দেখে অস্বস্তি হয় না। প্রতি রাত্রে টেবিলের ওপর পোজ দিয়ে দাঁড়াবার অভ্যাসও করতে হয় -- যেমন প্রতিযোগিতার সময় করতে হয়।

কথা বলছিলাম একতলার বসবার ঘরে। ওপর তলায় তখন অভিজিত রায় জুডকে প্রদর্শনীর ছটি দিচ্ছিলেন। শ্রীরায়েরও কুকুর আছে। চক্রবর্তী পরিবার এই বিশেষজ্ঞর কাছে কৃতজ্ঞ। একটি পমেরানিয়ানের আকার আকৃতি, ইংলন্ডের সারমেয় সংঘ যে রকম বলেছে, জুডকে সেই রকম ভাবে তৈরি করা হয়, প্রতিটি প্রদর্শনীর আগে। এর জন্য, কান, পা, লেজের গোড়া ও পেছন দিকের অবাঞ্ছিত লোমের অংশ ছেঁটে ফেলা (Trimming) হয়। কথার মধ্যে জুড একবার ঘুরে গেল। চলাফেরার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ। সমস্ত ঘরময় ঝলমল চকচক করছিল বিভিন্ন পারিতোষিক। আলমারি থেকে তাক ও টেবিলে উপচে পড়েছে। জুড বোধহয় সেদিকেও একবার নজর দিল। ওর সারা দেহে একটা আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন।

ইলাদেবী বলেছিলেন, 'জুডের জন্য আমাদের ও বেড়ানো হয়। তবে, এত টাকা খরচ, এত পরিশ্রম আর সহ্য হয় না।' জবাবে বলেছিলাম, 'এখন আর আপনার ফেরার রাস্তা নেই। এপ্রিল পর্যন্ত 'শো' করতেই হবে।' উনি এটা মেনে নিয়েছিলেন। এপ্রিলের মধ্যে নির্ধারিত হবে, বছরের সেরা সারমেয় কে হবে। এলেখা যখন ছাপা হবে তখন জুড আরও কয়েকটি সম্মান পেয়ে যাবে। ফেব্রুয়ারী মাসেই চণ্ডীগড় সারমেয় সংঘ, হরিয়ানা সারমেয় সংঘ ও মাদ্রাজ সারমেয় সংঘের প্রদর্শনী। মার্চ মাসে দেরাদুনে দুনভ্যালী সারমেয় সংঘের প্রদর্শনী।

তপন বাবু বলেছিলেন, ওঁর মা কুকুরদের নিজের বিছনায় শোয়ান। একবার একটা কুকুর খাট থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পায়। তারপর থেকে, ওঁর মা একটা ছোট পায়ের খাটে শোন, যাতে ওদের ওঠানামা করতে অসুবিধা না হয়। বললাম আপনারতো সন্তান স্নেহ জন্মে গেছে।' এর জবাবে ইলাদেবী বললেন, 'তার চেয়েও বেশী। নিজের সন্তানের জন্যে এত করতে হয়নি।' তারপর উনি একান্তে বললেন, "ওপর তলায় একটা ফ্ল্যাট হয়েছে। ভাড়া দিলে অনেক টাকা। আমি ভাড়া দেব না। কুকুরদের জন্য রোদ বাতাস দরকার। তা না হলে, নির্জীব হয়ে যায়। অনেক সময়, পা বেঁকে যায়। আমি ওদের নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে থাকব।' এই ভালবাসার কোন তুলনা নেই। এ মায়ের প্রকৃত মনের কথা। এই মাতৃস্নেহ যে পায়, তার জয়যাত্রা কোন শক্তি প্রতিহত করতে পারে না।□

লালবাড়ির রহস্য

খালিস্তানের জন্য ব্যাঙ্ক ডাকাতি

কমল

ব্যাঙ্ক ডাকাত জগতারের সুপ্রিম কোর্টের ভুয়ো আদেশ নিয়ে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা এবং তার সাগরেদ নীলমণি ঘোষের আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা সম্প্রতি খবরের রাজ্যে বেশ চাঞ্চল্য এনেছে।

এ ভাবে ভুয়ো আদেশ নিয়ে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা গোটা ভারতবর্ষে এর আগে আর হয় নি। নীলমণি আর জগতার সিং অন্ধকার রাজ্যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। '৮২ সালে এই জগতার কলকাতায় নিউ আলিপুর স্টেট ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

প্রথমে ধরা পড়েছিল নীলমণি। পরে জগতার। জগতার ছেলেবেলা থেকেই ডাকাত। দিল্লী, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে মোট ত্রিশ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কোন রাজ্যের পুলিশই তাকে জেলে ধরে রাখতে পারে নি। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গরাদ ভেঙে জগতার পালিয়েছে বহুবার।

বেহালায় যখন সে ধরা পড়ে তখনও সে ছিল ফেরারি। পুলিশের গোপন রিপোর্ট জগতারের সঙ্গে খালিস্তানিদের জোর যোগসাজস রয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশ অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছে খালিস্তানিরা জগতারকে তাদের আন্দোলনের জন্য টাকা তুলতে কাজে লাগিয়েছিল। জগতার খালিস্তানিদের লাখ লাখ টাকা দিয়েছে, সবই ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা। ভিন্দ্রানওয়ালের যে ছিল মন্ত্র এবং অন্ধশিষ্য। ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গে সে বহুবার দেখা করে। গুরুই তাকে কুড়ি লাখ টাকা তুলে দিতে নির্দেশ দেন।

জগতার প্রথমে দ্বিধা ও সংশয়ে বলেছিল গুরুজি, ও যে ডাকাতির টাকা। তা দিয়ে সৎকাজ হবে কী করে? গুরুজি এর উত্তরে বলেছিলেন, তাতে কী। লক্ষ্য মহৎ হলেই হল। গুরুজির আশীর্বাদ নিয়ে জগতার নেমে পড়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতির কাজকর্মে। জগতার কথা রেখেছিল। সে বারো লাখ টাকা ভিন্দ্রানওয়ালের হাতে তুলে দেয়। খালিস্তানিদের অস্ত্রশস্ত্র কেনার কাজে ভিন্দ্রানওয়ালের সেই টাকা লাগান।

এইচ. এ. সফি - গোয়েন্দা ডি.সি. (১)

আই বি এবং 'র' এই গোপন খবর দিয়েছে। জগতার পাঞ্জাবি এবং শিখ। ভিন্দ্রানওয়ালের ফাণ্ডে টাকা তুলে দিয়ে ব্যাঙ্কডাকাত জগতার নিজেকে ধন্য মনে করছে। জগতার খুবই চালাক। সে কয়েকজন ভি আই পির সঙ্গে ফটোও তুলে নিয়েছিল। যেমন সি পি এমের কয়েকজন নেতার সঙ্গে তাঁর যেমন ছবি আছে তেমনি দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও সঙ্গে তার ছবি রয়েছে। কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ বেহালায় তার গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে এই সব ছবি হাতিয়ে নেয়। পুলিশ এলে এই সব ছবি দেখিয়ে সে তাদের নার্ভাস করার চেষ্টা করত। তিন বছর আগে পুলিশ যখন বেহালায় তার আস্তানায় হানা দেয় তখন এই সব ছবি দেখে পুলিশরা বেশ ভড়কে যায়। খালিস্তানি নেতাদের সঙ্গে ওর ছিল ঘনিষ্ঠতা। '৮২ সালের মাঝামাঝি নিউ আলিপুরে ডাকাতি করলেও তার বহু আগে জগতার কলকাতায় ঘুরে যায়। '৮১ সালের মে মাসে কলকাতায় এসে সে আস্তানা করে। ভবানীপুরের শিখ গুরুদ্বারে থাকত। কলকাতার শিখ নেতারা তাকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। দক্ষিণ কলকাতার একটি গুরুমুখী কাগজের দুইজন সাব-এডিটর জগতারের দলে ভিড়ে যায়। এরা খালিস্তানি বুদ্ধিজীবি। নিউ আলিপুর স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে এই দুই সাংবাদিক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। জগতারের সঙ্গে এরাও ব্যাঙ্কের টাকা লুট

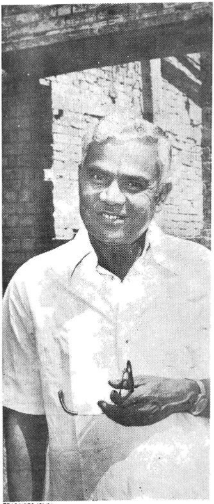

সবাইকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পিয়ারলেস

আজ আমি সত্যিই সুখী। ছোট হলেও নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে পেরেছি।

কিছুদিন আগেও বাড়ী তৈরীর কথা আমার কাছে দিবাস্বপ্ন বলেই মনে হতো। কারণ, এমন কিছু বড় চাকরী তো আমি করতাম না, এরই মধ্যে ছেলেকে মানুষ করেছি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

ঘটনাচক্রে কিনে ফেলেছিলাম পিয়ারলেসের অল্প টাকার একটা সার্টিফিকেট। সম্বল বলতে তখন ছিল ঐ কটা টাকাই।

সেই সূত্রেই পিয়ারলেসের সঙ্গে যোগাযোগ। ও'রাই আমার বহুদিনের স্বপ্নকে জাগিয়ে তুললেন, তাকে বাস্তবায়িত করবার পথ দেখালেন।

আজ আমি একজন পিয়ারলেসের ইন্সপেক্টর। একটা বিশাল পরিবারের একজন। সবার আশীর্ব্বাদে আজ আমি সুদিনের মুখ দেখতে পেয়েছি। পিয়ারলেসেরই সহায়তায়। আমার বহুদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক।

সামান্য সঞ্চয় যে ভবিষ্যতের এতবড়ো সহায় হতে পারে — আমার চেয়ে একথা আর ভালো কে বুঝবে?

ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ঈস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

সরকারী তহবিলে মোট লগ্নী ৫০০ কোটী টাকার উর্দ্ধে

PRASA/PGF-131/84

করতে গিয়েছিল। এই স্টেট ব্যাংকের ডাকাতিতে জাগতারকে কলকাতার কয়েকজন খালিস্তানি শিখনেতা মদত দিয়েছিলেন। মারের চোটে তাদের নামও সে বলে দেয়। কিন্তু শাসক দলের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা থাকায় গোয়েন্দা পুলিশ ধরপাকড় করেনি। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা যায় এরাই যারা জগতারকে মদত দিয়েছিল তারাই ডি আই জি এস এস মানকে আশ্রয় দেয়। জগতার ভেবেছিল কলকাতার সে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে দুপয়সা কামিয়ে নেবে। কিন্তু ধরা পড়ায় তার সেই ভুল ভেঙ্গে গেল। ধরা না পড়লে হয়তো কলকাতায় খালিস্তানি ডাকাতরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুনু গোয়েন্দার তৎপরতায় তা আর হয় নি। [কিন্তু নীলমণি ঘোষের সঙ্গে জগতারের আলাপ হল কী করে?] চেতলার বস্তির বাসিন্দা নীলমণি। এক ট্যাক্সি চালক জগতারের সংগে নীলমণির পরিচয় করিয়ে দেয়। নীলুও ভালমানুষ নয়। ব্যাংকের খোঁজখবর সেইই জগতারকে দিত। নীলমণি আগে ধরা পড়েছিল। ও যখন জেলে যায় তখন জগতার ওর মাকে বলে। যেমন করে হোক তোমার ছেলেকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনব। হয়তো এই কথা রাখতেই সুপ্রিম কোর্টের ভুয়ো আদেশের কৌশল নিতে হয়েছিল জগতারকে। এই ভুয়ো আদেশের পেছনেও রয়েছে খালিস্তানি অ্যাডভোকেট চক্র। এই আদেশের ভাষা এমনই নির্ভুল যে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না। সিল,সই সবই আসল বলে ভুল হয়। সাদা চোখে আসল আর নকলের ফারাক ধরা পড়ে না। পুলিশের সন্দেহ সুপ্রিম কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এই অ্যাডভোকেট আদালতের আদেশ নানা ধরণের সার্কুলারের ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

এই খালিস্হানি অ্যাডভোকেট, আদালত ও জেলের একটি প্রভাবশালী চক্র ভুয়ো আদেশ দিয়ে জগতার ও নীলুকে জেল থেকে ছাড়াবার চেস্টা করেছিল। নীলু ছাড়া পেয়ে আবার ডাকাতিতে হাত লাগায়। মিরাট জেলেও সুপ্রিম কোর্টের ভুয়ো আদেশ আসে। জাগতার প্রায় ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল আর কি? কিন্তু রুণু গোয়েন্দা নীলমণি ঘোষের কাছ থেকে আসল খবর পেয়ে মিরাট জেলে জরুরি তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সে শেষমেষ মুক্তি পায় নি। এর আগে জগতার তিহার জেলের পাচিল টপকে পালায়। নবার সে অন্য কৌশল করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেল থেকে সে মুক্তি পায় নি।□

রাজনীতির নেপথ্যে

গোবর্ধন মিত্র

এক কোটি টাকা বাজেটের দুটো বিয়ে নিয়ে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মহলে যে নিদারুণ কানাকানি শুরু হয়েছে, তার মুখ্য হেতু উভয় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি।

কলকাতার বিরাট শিল্পপতি রঘু মোদির মেয়ের সঙ্গে বোম্বাইয়ের আরও বিরাট কান্তি দেশাইয়ের ছেলের তিলক অনুষ্ঠান মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল ১০ ফেব্রুয়ারি, রঘুজির বাড়িতে। শ চারেক বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে জ্যোতি বসুই ছিলেন মধ্যমণি। তিনি হাসিমুখে সারাক্ষণ শুধু হাজিরই ছিলেন না, হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ করে যে ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছিল তার সদ্ব্যবহারেও পরাঙমুখ হননি।

দ্বিতীয় বিবাহটি হয়ে গেল ২১ ফেব্রুয়ারি। রাজেন্দ্র পোদ্দারের ছেলে এবং দেবী বাজোরিয়ার মেয়ে। রাজেনবাবুর মেয়ের বিয়েতে জ্যোতি বাবু যাবেন না? তাও কি সম্ভব?

*

মুখ্যমন্ত্রী যেমন বড়লোকের বাড়ির বিয়ে শাদি মিস করেন না, সেই রকম সেচমন্ত্রীর কোন সহকর্মী অসুস্হ হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেনই। কানাইবাবুকে কিছুতেই বেঁধে রাখা যাবে না। কল্যাণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে কানাইবাবুর শেষ সাক্ষাৎ বেলভু নারসিং হোমে। মৃত্যুর পর কল্যাণবাবুর স্ত্রীর কাছে তিনি এবং আর যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা কোন ব্যাপারেই মুখ্য হতে পারেন নি। যেমন প্রণব মুখোপাধ্যায়। আসানসোলে শ্মশানঘাটে হঠাৎ হাজির হয়েছিলেন প্রশান্ত শূর। তিনিও সব সময়েই গৌণ।

*

ইন্দিরার একটি স্বভাব রাজীব অনুসরণ না করায় এ রাজ্যের অনেকে মুষড়ে পড়েছেন। এঁরা ইন্দিরাজির কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি চিঠি লিখতেন, জবাবও পেয়ে যেতেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ইন্দিরাজির চিঠি দেখিয়ে বেড়াতেন অনেকেই। রীতিমত বুক ফুলিয়ে। রাজীবের কাছে আরও বেশি সংখ্যায় চিঠি যাচ্ছে। কেউ জবাব পেয়েছেন বলে শুনিনি। এক পত্র প্রেরক একজন এম. পিকে অনুযোগ করতে গিয়েছিলেন। যা জবাব পেলেন তা হতবাক হবার মতোই। বলেছিলেন, দুঃখ পাবেন না, আমিও জবাব পাচ্ছি না!

* *

এস. ইউ. সি নেতা ফটিক ঘোষ যে পি টি. উষার চেয়েও ভাল দৌড়তে পারেন, তা তাঁর দলের নেতারাও নাকি জানতেন না। আইনজীবি দ্বিজেন সেনগুপ্তর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল কুলতালি যান, তাঁদের সহযাত্রী হয়েছিলেন এস. ইউ. সি নেতা ফটিক ঘোষ এবং দলের বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার। ফটিক ঘোষকে দেখেই স্হানীয় কংগ্রেসীরা চিনে ফেলেন। কৌশলে দলছুট করে তাঁর উপর উত্তম মধ্যম বর্ষণ চলতে থাকে। ফটিক ঘোষ তখন ধানের ক্ষেত, আম বাগান প্রভৃতি অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে পরিত্রাহি দৌড়তে শুরু করেন। ক্রুদ্ধ কংগ্রেসীরা ওঁর সঙ্গে পাল্লা দেবেন কি করে?

ফটিক ঘোষের শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। ঝড় বয়ে গেছে তাঁর শার্ট আর প্যান্টের উপর দিয়ে। দেবপ্রসাদ অক্ষতই ছিলেন। তাঁকে কেউ চিনতেই পারেন নি।

কিন্তু একটি ব্যাপার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। ফটিকবাবুর এই হেনস্হার কথা দ্বিজেন কমিটি বেমালুম চেপে গেলেন কেন? এস ইউ সিই বা ব্যাপারটা চাপিস করে কী বিপ্লবিয়ানা দেখালেন?

* *

কংগ্রেস রাজনীতির সবচেয়ে চমকদার খবর হল: শত-সুব্রত একজোট হয়েছেন। এই অভাবনীয় ঘটনাটি যাতে কেউ অবিশ্বাস না করেন তার জন্য উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতার দুই নেতার বি পি এন টি ইউ সির এক মিছিলের পুরোভাগে পাশাপাশি থাকবার কথা আছে। □

কলকাতার একটি মুমূর্ষু হাসপাতাল

শহরের প্রায় সবকটি হাসপাতালে যেখানে ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব, সেখানে রুগী আর অর্থের অভাবে মানিকতলার জিতেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাসপাতালটি প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ রোড ও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই সেবাকেন্দ্র এখন শ্মশানের মত নিস্তব্ধ, কর্মীদের মনে বর্তমানের অসহায়তা আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা।

১৯৫৬ সালে জে. এন. রায় শিশু ভবনের প্রতিষ্ঠা করেন প্রয়াত মৃন্ময়ী রায় এবং এইচ. এন. রায়। প্রসূতিদের জন্য ফ্রি ১৮টি বেড সহ মোট ৭৫টি বেড ছিল। ১৯৭৬ সালে রাজ্যসরকারের তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা সরকারের সংরক্ষিত ৫০টি ফ্রি বেডের ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে ১৫ টি আসন প্রসূতিদের জন্য সংরক্ষিত, ৩টি শিশুদের জন্য সরকারের সংরক্ষিত আসন, উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন দপ্তরের সংরক্ষিত আসন ২০টি এবং সাধারণ শিশুদের জন্য সংরক্ষিত ১২টি আসন। রাজ্যের নানা হাসপাতাল থেকে অতিরিক্ত রোগীদের এখানে পাঠানো হত। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রোগী বা অর্থের অভাব এখানে প্রকট হয়ে দেখা যায়নি।

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার এসে উদ্বাস্তু শিশুদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা ২০ থেকে কমিয়ে করেন ৪টি। গত কয়েকবছরে ওষুধপত্রসহ হাসপাতালের সমস্ত খরচই ভীষণরকম বেড়ে গিয়েছে। টাকাপয়সার অভাবে হাসপাতালের একমাত্র লিফটটি কয়েক বছর ধরে অচল বিছানার তত্ত্বপোষগুলির অবস্থা শতচ্ছিন্ন, 'থিয়েটার রুম'এর আসবাবপত্রে মরচে ধরে গেছে, নড়বড়ে 'অপারেশন টেবিল'টি পর্যন্ত বদলানো যাচ্ছে না।

হাসপাতালের কর্মীসংখ্যা সব মিলিয়ে ৭৮ জন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ডাক্তারি বিভাগের ১৭ জন, নার্সিংয়ের ২৪ জন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী যথাক্রমে ৭ জন ও ৩০ জন। কোন নির্দিষ্ট বেতনহার নেই। সামান্য পরিমাণ মাসিক সহায়তা এঁরা পেয়ে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই এই দুর্মূল্যের বাজারে এঁদের তরফ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এমনিতেই সরকারি অনুদানে হাসপাতালের খরচ মিটছে না। বহু ক্ষেত্রে পরিচালন কমিটির সদস্যরা নিজের টাকায় হাসপাতালের বিভিন্ন খরচ মেটাচ্ছেন। অবিলম্বে সরকারি অনুদান না বাড়ালে হাসপাতালটি চালানো অসম্ভব। নানা কারণে 'সিটু' সমর্থিত হাসপাতালের কর্মী সংঘের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ভাল নেই।

চারতলা এই হাসপাতালে রোগীর ভিড় নেই, নেই চিন্তিত মুখ অসহায় মানুষের দল। অথচ শহরের অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে রোগীরা যে কোন ভাবে জায়গা পেলে বর্তে যায়। রোগীরা কেন আসছে না, এই প্রশ্নের জবাবে কর্তৃপক্ষ বা কর্মীরা জানালেন, অর্থাভাবে বহু সময়েই প্রয়োজনীয় ওষুধ তাঁরা দিতে পারছেন না। সচ্ছল পরিবারের রোগীরা কোন সময়েই এধরনের সেবাকেন্দ্রে আসেন না। হাসপাতালকে বাঁচাতে গেলে সরকারকেই তাই এর ভার গ্রহণ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ১৯৮৪ সালের ১৮ জুলাই রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা হাসপাতালটি পরিদর্শনে আসেন। কর্তৃপক্ষ জানান, গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কের চার্চ লেন শাখা থেকে ২০ হাজার টাকা 'ওভারড্রাফট' নেওয়া হয়েছে, তিন চার বছর ধরে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না,

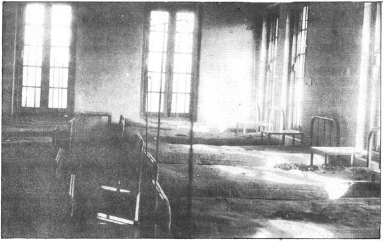

ডিজিটিং কর্মীরা চার মাস টাকা পাননি, বহু বছর হাসপাতালে মেরামতের কাজ হয়নি।

কর্মীদের অনেকেই হাসপাতালের এই দুরবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষকেই সরাসরি দায়ী করেন। কর্মীদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন ডাঃ উদয়ন রায়। তিনি জোর দিয়ে জানালেন হাসপাতালে কোন আর্থিক ঘাটতি নেই। অন্ততঃ কর্তৃপক্ষ কোন 'ডেফিসিট রিপোর্ট' সরকারকে দেখায়নি। পরোপকার আর সমাজসেবার মুখোশ এঁটে কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ বিভিন্ন অসাধু কাজে লিপ্ত আছেন। ডাঃ রায় জানালেন, অসাধু কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগের জন্য ১৯৮৩র শেষদিকে তৎকালীন সচিব ও সুপার ডাঃ অজয় ঘোষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নর্থ সুবার্বন, মেয়ো, উপেন মেমোরিয়াল সহ বেশ কয়েকটি হাসপাতাল সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। এই হাসপাতালের প্রতি সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কর্মীরা ক্ষুব্ধ। একমাত্র সরকারি অধিগ্রহণেই হাসপাতালটি বাঁচতে পারে। আর্থিক অনুদান বাড়ানো অনেকটা ফুটো কলসিতে জল ঢালার সামিল।

সেবাকেন্দ্রটি তৈরি করার সময়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এম. সি. খান্না ও নির্মল দে সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। হাসপাতালের পাশে একই চত্বরে শিশুদের একটি বিদ্যালয় রয়েছে। অজিত পাঁজা একসময়ে এখানকার ছাত্র ছিলেন। তিনি এই হাসপাতালের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দাতা হিসাবে কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবছর হাসপাতালের খরচ ও সরকারি অনুদানের মাঝে ফারাক থেকে যাচ্ছে প্রায় এক লক্ষ টাকা। আর্থিক সহায়তার জন্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাবেন। এতে সমস্যার সামান্য সমাধান হতে পারে।

রাজ্যসরকার রোগীর অপ্রতুলতার জন্য হাসপাতালের অনুদান কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল থেকে এখানে আর রোগী পাঠানো হচ্ছে না। অনেকের ধারণা, কোন বিশেষ কারণে সরকার এই সেবাকেন্দ্রটিকে বিশেষ সুনজরে দেখছেন না। সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন কাজ হয়নি। উপরন্তু কাছেই সরকারী উদ্যোগে আরেকটি হাসপাতাল তৈরি করার কথা চলছে।

প্রায় তিন দশকের পুরোনো এই সেবাকেন্দ্রটিকে বাঁচাবার জন্য অবিলম্বে সরকার ও স্থানীয় অধিবাসীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। কিছু মানুষের রুজি-রোজগারের প্রশ্নই শুধু নয়, সাধারণ শহরবাসীর সেবাশুশ্রূষার সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নটিও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।□

নাম মাহাত্ম্য

দিশাহারা শর্মা

পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল করার প্রস্তাবে আনন্দবাজার পত্রিকা বড়ই চটিয়াছেন। গত ১৯ জানুয়ারি একখানি চোস্ত সম্পাদকীয় ঝাড়িয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদের বেশ এক হাত লইয়াছেন, অবশ্য উদ্যোক্তাদের নাম না করিয়া। 'কিছু রাজনীতিক', 'কিছু কংগ্রেসী এম পি', 'কিছু বিজয়ী প্রার্থী' ইত্যাদি শব্দের ধারে–ধারে যতদূর বলা যায় তাহার বেশি আর কিছু এই সম্পাদকীয় নিবন্ধকার তাঁহার পাঠকদের জানিতে দেন নাই। পাছে পাঠকরা জানিয়া ফেলেন যে, এই 'কিছু কংগ্রেসি এম পি-র' মধ্যে একজন হইতেছেন আনন্দবাজারের জাতিশত্রু তরুণকান্তি ঘোষ সেইজন্যই পাঠকদের প্রতি পরম করুণার বশে নিবন্ধকার কাহারও নাম না করিয়াই শূন্যে গদা ঘুরাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রস্তাবটি 'অবান্তর', 'সস্তায় কিস্তিমাত' করার চেষ্টা, 'মনভোলানো চুষিকাঠি', ' খই ভাজা' 'রঙিন ফানুস' ইত্যাদি।

এহেন অবান্তর প্রস্তাব যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম করার প্রয়োজন বোধ না করিলেও অবান্তর প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য আনন্দবাজার অবশ্য কী ভাগ্যি জ্যোতি বসুর নাম করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ধমকধামক দিয়েছেন। জ্যোতিবাবু যে পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল করিবার প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, উদ্যোগটি ভাল এবং এই রাজ্যের নাম আগেই বদলানো উচিত ছিল সেই খবর অবশ্য আনন্দবাজার পত্রিকাকে অন্য সংবাদপত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কেননা, কলিকাতার অন্যান্য সংবাদপত্রে জ্যোতিবাবুর এই বিবৃতি প্রকাশিত হইলেও আনন্দবাজারে কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কী আশ্চর্য! আনন্দবাজারের ধর্মঘটের সময় আমরা তো ঐ পত্রিকারই বাঘা বাঘা সাংবাদিকদের কাছে শুনিয়াছিলাম, "শুধু আনন্দবাজারই খবর ছাপে, অন্য সবাই খবর চাপে।" অবশ্য যদি বলা হয় যে, তরুণকান্তি ঘোষ ও অজিত পাঁজা পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, এগুলি কোন খবরই নয়, শুধু সম্পাদকীয় নিন্দামন্দের যোগ্য, তাহা হইলে অবশ্য অন্য কথা। সত্যই তো কোথায় কে কী বলিল, কী করিল এসবের কী সংবাদমূল্য আছে? আসল কথা হইল, আনন্দবাজার পত্রিকা কোন্ ব্যাপারে কী মনে করেন।

যেমন, আনন্দবাজার মনে করিয়াছিল, বারাসত কেন্দ্র হইতে লোকসভার নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে তরুণকান্তি ঘোষকে মনোনয়ন দেওয়া কংগ্রেসের উচিত হইবে না। আনন্দবাজার তাঁহাদের মনের কথা প্রকাশ করিয়া তরুণকান্তির মনোনয়ন আটকাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ কংগ্রেস হাই–কম্যান্ডকে তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের জনমত গঠন করেন আনন্দবাজার পত্রিকা এবং তরুণকান্তি ঘোষকে মনোনয়ন দিয়া কংগ্রেস যেন আনন্দবাজারকে চটাইয়া না দেয়। যে গোপন লিপিতে সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং ঐ গোষ্ঠীর 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় সেটি গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হইয়াছিল।

তরুণকান্তি ঘোষের মনোনয়ন যখন আটকানো গেল না তখন ঈর্ষাপরায়ণা রমণীর ন্যায় আনন্দবাজার পত্রিকার মনের ভাব হইল, "দারোগা হইলে কি হইবে, বেতন পাইবে না।" শুধু মনে করাই নয়, মনের এই মাধুরি মিশাইয়া সংবাদও প্রণীত হইল। পত্রিকার সংবাদদাতারা নির্বাচন কেন্দ্রে ঘুরিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তরুণকান্তি ঘোষ দুই হাতে টাকা ছড়াইয়া ভোটারদের হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু চিত্ত বসুর কাছে তিনি হারিয়া ভোল হইয়া যাইবেন। নির্বাচনের ফল অবশ্য অন্য রকম হইল। কিন্তু হইল তো হইল, তাহাতে কীই বা আসে যায়? যাহা ঘটে তাহা তো সংবাদ নহে, আনন্দবাজারের মনোভূমিতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই সংবাদ এবং সেইজন্যই আনন্দবাজার হইতেছে সংবাদপত্র, অন্যগুলি নহে।

আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁহারা বাঙালিকে নেশা ছাড়াইতে চাহেন। নাম বদল নাকি বাঙালির কাছে এক অপ্রতিরোধ্য নেশার মতো। দৃষ্টান্ত– "চৌরঙ্গী ভোল পালটাইয়া জওহরলাল নেহরু হইয়াছেন, ধর্মতলায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন লেনিন, অকটরলনি মনুমেন্টের গায়ে লেবেল আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে শহিদ মিনার।" এই সব নাম বদল করিয়া নাকি ইতিহাস বদল করা সম্ভব নহে। বিনয়বশত আনন্দবাজার পত্রিকা শুধু এইটুকু বলিতে বাকি রাখিয়াছেন যে নাম বদল করিয়া ইতিহাস বদল করা সম্ভব হইয়াছে একমাত্র সুটারকিন স্ট্রিটের নামান্তর করিয়া প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট নামকরণ করায়!

'নামৈব কেবলম্।' বটেই তো! □

চিরুর চারুকলা ও উদিত চিত্রভানু

স্বরাজ মজুমদার

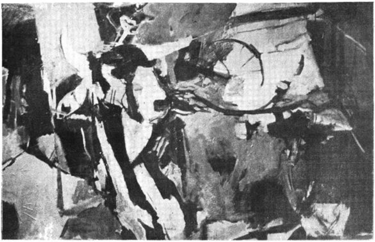

তেল ছবি/শিল্পী চিত্রভানু মজুমদার

একদা ফারদপুরের ছেলে চিরু এখন বোম্বাই নিবাসী। পুরো সময়ের পুরো-দস্তুর শিল্পী। আগে ড্রাফটসম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। সিনেমা শিল্পের সাথেও বেশ কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ছবি আঁকেন। চীনে মাটি, তামা, এ্যালুমিনিয়ম ও মোসেইক মাধ্যমে ভাস্কর্য গড়েন। ম্যুরালে চিত্রিত করেন নানান চিত্রকল্প।১৯৮০তে বিড়লাএকাডেমীর পর একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর চলতি প্রদর্শনীটি কলকাতায় শিল্পীর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী।

দক্ষিণ গ্যালারীর চার দেয়াল জুড়ে গোটা ত্রিশ কাজ ছিল। সবই সাদা-কালোয় কালি-কলমের ফসল। বেশ পরিণত কাজ। যত্ন নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাদা জমির ওপর চিরু কখনও ঘন করে, কখনও হাল্কা জালিজালি করে এক স্বপ্নময় বুনোট তৈরি করেছেন, যে বুনোটের আলো-ছায়ার মায়া জাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দর্শক কখনও পেয়ে যান জীব দেহের অসংখ্য পেশীর সন্ধান অথবা কোনো মহীরুহের আদ্যডাগের আদল। মাজ্ঞা দেয়া রেখা দক্ষ হাতে টানাটানি করার ফলে একটা টেনশনের সৃষ্টি হয়। ছবির মধ্যে উঠে আসে একটা ভাব, একটা বিস্তৃতির ভাব। প্রয়োজনমত জায়গা ছেড়ে রেখা সন্নিবিষ্ট করায় বিমূর্ত অথচ একটা সহজ ছন্দও ছবিতে যুক্ত হয়েছে।

চিরুর ছবিতে একটা সহজ ভাব আছে যার ফলে সাধারণ দর্শকেরও ছবির মূল রসটি উপভোগ করতে বেগ পেতে হয় না। নির্মিতির মুন্সীয়ানাও তারিফ করার। ঐটির অভাবে অনেক শিল্পীর কাজেই-বিশেষত যে কাজ বক্তব্য প্রধান নয়, নয় বিষয় নির্ভর, এক ঘেয়েমি এসে যায়। তা যাতে না হয়, এব্যাপারে শিল্পী বেশ সতর্ক। তাই গতিশীল রেখা দুমড়ে মুচড়ে যেখানে একটা জমাট ভাব ধারণ করেছে, সেই সব রৈখিক পেশীর জোড়ে জোড়ে কখনও হাতে লেখা দুএকটি শব্দ বা লাইন বসিয়ে দিয়েছেন। তাতে স্বভাবতই একটু বৈচিত্র্য এসেছে।·পরিশেষে ব্যক্তি হিসাবে শিল্পীর মেজাজের সাথে আমার পরিচয় নেই। তবে তাঁর কাজের মেজাজে আছে একটা গম্ভীর বিষণ্ণভাব। হয়ত বা যন্ত্রণাও। ছবি দেখে বেরিয়ে আসার পরেও সেই যন্ত্রণার ভাবটা মনে থেকে যায়।

সর্বদা হয়ত নয়, তবুও বলব শিল্পে হেরেডিটির মূল্য আছে। তরুণ চিত্রভানু মজুমদারই তার প্রমাণ। প্রয়াত শিল্পী নীরদ মজুমদারের পুত্র চিত্রভানু। শ্রীমতী শানু লাহিড়ী তাঁর পিসি। অতএব রক্তের মধ্যে শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক টান নিয়েই জন্মেছেন তিনি। সরকারি চারু ও কারুকলা কলেজের অত্যান্ত কৃতী ছাত্র চিত্রভানু একাডেমীতে এই প্রথম তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী করলেন (২৫-৩১ জানুয়ারি)।

প্রদর্শনীর নাম 'আনটাইটল্ড'। অর্থাৎ ছবির কোনো নাম নেই। চিত্রভানু ছবির কোনো নাম দিতে চাননি। কারণ তিনি বিষয়-নির্ভর ছবি আঁকতে চান না। স্বত:স্ফূর্ত রেখা আর মর্জি-মেজাজ অনুযায়ী রঙ চাপিয়ে পটের শূন্যতাকে ভেঙে তাকে পূর্নির্মাণ করে আনন্দলাভ ও আনন্দ বিতরণই শিল্পীর উদ্দেশ্য। অবশ্য এটা কিছু নতুন নয়। সব শিল্পীকেই বিশেষত যাঁরা সাদৃশ্যধর্মী ছবি আঁকেন না, এটা করতে হয়। নচেৎ ছবি হয় না। তবে চিত্রভানুর বয়স অল্প বলেই হয়ত কিছুটা সোজাসুজি বলে দিয়েছেন যে তাঁর ছবিতে অনর্থক 'ভাবনা' খোঁজার দরকার নেই। কারণ তিনি নিজেই ভাবেন নি। এই সততা অভিনন্দন যোগ্য।

বড় বড় পটে চিত্রভানু তাঁর এই চাক্ষুষী আবেদন সৃষ্টির খেলায় মেতেছেন। এই কাজে মূলত তিনি সাদা, কালো ও চাপা ধূসর

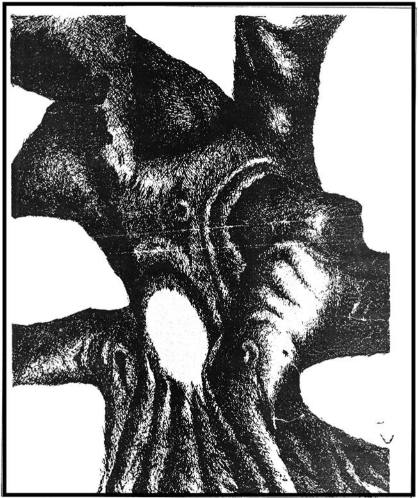

ড্রইং/চিরু চক্রবর্তী

কিছু মিশ্র রঙ ব্যবহার করেছেন। একটি তেল-ছবি ছাড়া উজ্জ্বল রঙ তাঁকে ব্যবহার করতে দেখা গেল না। নীরদবাবুর প্রভাব এখানে কিছুটা পড়েছে। রঙ ব্যবহারে সংযম সর্বদাই আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু এই বয়সে তরুণ মনের বেপরোয়া ভাবটাই আমরা দেখি না কেন। একটি ছবি যেখানে তিনি উজ্জ্বল লাল দিয়ে এবং কিছুটা নীলের সাহায্যে ষাঁড়ের লড়াইয়ের আভাস দিয়েছেন, বেশ উপভোগ্য হয়েছে। অন্য আর একটি কাজে এক তরুণীকে চিত্রিত করেছেন লম্বালম্বি, তাঁর প্রিয় রঙেই। তবে পটের নীচবরাবর প্রুশিয়ান ব্লু ব্যবহার করায় ছবিটিতে একটু উজ্জ্বলতা এসেছে যা রমণীর মুখের বিষণ্ণতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সব ছবিগুলো দেখলে কিন্তু চিত্রভানু যাই বলুন না কেন, ধারণা অন্যরকম হয়। মনে হয় তিনি আপাতঃ রূপের কথা যতই বলুন না কেন, বস্তুনির্ভর, বিষয় নির্ভর, ভার নির্ভর অন্তর্মুখীন ছবির জগতই তাঁকে হাতছানি দিচ্ছে। প্রথম প্রদর্শনী হিসাবে চিত্রভানু সম্ভাবনাময়ময়। □

ধারাবাহিক

নূপুরের মতো

অনুলিখন ঃ অনুপমা দাশ

ষোল

তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে আমি গেলাম সেই বারনেটের দোকানে। ওরা আমাকে চিনতো। কোনরকম আগাম না নিয়েই আমার অর্ডার নিল। ডেলিভারি নেবার সময় দাম দিলেই চলবে। আমার মনত খুব খুশি তখন। যাক, একটা কিছু করতে পারবো এবার। কিন্তু ডেলিভারি নেবার দিন হিমাংশু বাবুর কাছে টাকা নিতে গেলে তিনি তাঁর অক্ষমতার কথা বলে আমাকে এড়িয়ে গেলেন। তখন আমি কী করবো ভেবে পেলাম না। পায়ের তলার মাটিটুকুও যেন সরে যাচ্ছে। কোথাথেকে বারনেট-এর বিল মেটাবো? যার খাবার কেনার পয়সা নেই, সে কি করে দেবে টাকা? কাজেই কসটিউমগুলি তখন ডেলিভারি নেওয়া সম্ভব হলো না। তবে পরবর্তীকালে যখনই একটু টাকা এসেছে হাতে, তখনই তার থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে একটু-একটু করে দীর্ঘদিন ধরে শোধ করেছি তার দাম। যাক, সে কথা-এই হিমাংশু রায়ের সঙ্গে বহুদিন বাদে আবার দেখা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। আর সে ঘটনাও বড় মজার ঘটনা। পরে যথাসময়ে বলব সে কথা।

কোথাও যেন আলো দেখতে পেলাম না। শুধু ল্যান্ডলেডির মমতা মাখানো মুখটি মনের মধ্যে ভাসে, কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে। 'মা' বলে ডাকতে ইচ্ছা করে।

পেটে জ্বলন্ত খিদে, মাথায় দুশ্চিন্তা, আর বেশ হাড় বার করা শরীরটা নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক একবার মনে হয় কী লাভ এভাবে বেঁচে থেকে?

তবু মনের মধ্যে, কে যেন বলে যে জীবনের আশা তো এখনও পূর্ণ হয়নি। ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতো। সেই সময় হঠাৎ একদিন মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেয়াল হলো-একজনের নাম, তিনি সেই মৃণালিনী সেন। আশ্চর্য, এতদিন কেন তাঁর কথা মনে হয়নি? তিনি তো সবই জানেন। আমার নাচের জগতে প্রবেশ হয়েছিল তো ওঁরই অনুরোধে। ওয়েম্বলি এক্জিবিশনের ইন্ডিয়া ডে-তে নাচ, লেডি ডোরবজী টাটা ও পাবলোভার সঙ্গে যোগাযোগ সবই তো তারই উদ্যোগে।

মিসেস সেন!-ভাবতে ভাবতে হেঁটেই চলে এলাম তাঁর বাড়ি। শহরের অন্যপ্রান্তে তাঁর বাড়ি। সেদিন সে দূরত্বকে কিছুই মনে হয়নি। তিনি আমাকে এতদিন বাদে দেখে খুবই খুশি হলেন। তারপর আমার আসবার কারণ শুনলেন। তাঁকে বললাম, পাবলোভার উপদেশের কথা-আমি এদেশে নিজের দল গড়বো। বিদেশে দেখাবো ভারতীয় নৃত্য। কিন্তু তার জন্য চাই টাকা। টাকার কথায় তিনি বেশ গম্ভীর হলেন। পাবলোভার কাছ থেকে রয়্যালটি পাবার কথা, তাছাড়া সপ্তাহে সপ্তাহে দুশো ডলারের কথা-সবই তিনি জানতেন। তাই একটু অবাক হয়েই আমার দিকে তাকালেন। একটা সন্দেহের বশে তিনি আমায় বললেন, 'সাবধানে থাকা উচিত তোমা'র। বিদেশে এসে সাধারণত' ভারতীয় ছেলেরা টাকা পয়সা বেহিসেবির মত খরচ করে। অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা তারা করে। আমি এসব মোটেই প্রশ্রয় দিই না। একটু বুঝে-সুঝে চলবে তো?

তাঁর কথাগুলোয় আমার কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। অবুঝ আমি হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা কোথায় আমার? আমি তো কোন দোষ করিনি। হায় ভেরা!

মৃণালীনি দেবী কথা শেষ করে পাশের ঘরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে সামনে রাখা মার্বল পাথরের টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলেন একটা মুদ্রা। ঠং আওয়াজ করে পড়লো সেটা। দুই শিলিংয়ের একটা মুদ্রা।

একটা আত্মধিককারে, অপমানে, গ্লানিতে মনটা ভরে গেল। মাত্র দু শিলিং? মিসেস সেন আমাকে এত নিচ ভাবলেন? আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। টেবিলের উপর পড়ে রইলো মুদ্রাটা।

বুঝতে পারলাম-লোকে আমার দৈন্য দশাকে কী চোখে দেখছে। তারা ভাবছে-অত টাকা-পয়সা রোজগার করে আমি সে টাকা উড়িয়ে নষ্ট করেছি। কিন্তু সত্যটা কেউ তলিয়ে দেখবে না। এক অপরিণত অনভিজ্ঞ যুবকের কথা বিশ্বাস করবে না।

জানিস অনুপমা, আজও আমি অনুভব করতে পারি সে-দিনের কথাগুলো। মিসেস সেনের বাড়ি থেকে কী মন নিয়ে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম তা শুধু ভগবানই জানেন। ছোটবেলায় সেই গুন্ডা খোকাটার জীবনের সঙ্গে এ-জীবনটার কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। তখন যেমন কেউ পরোয়া করতো না-কোথায় কি করছি, কেমনভাবে আমার দিন কাটছে, এখনও তেমনি কেউ মাথা ঘামায় না কী খাই, কেমন করে দিন কাটাই!

এসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে নির্জন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের উপর এসে দাঁড়িয়েছি খেয়াল ছিল না। শুধু যে আত্মগ্লানিতেই মনটা আচ্ছন্ন ছিল তা নয়। একটা নিষ্ঠুর ইচ্ছা যেন আমার সব সম্বিত গ্রাস করছিল। পেটের খিদেটা শুধু মাঝে-মাঝে জ্বলে উঠছিল, আর তখন মনে হচ্ছিল-অসহ্য ! কী লাভ এভাবে বেঁচে থেকে? আর বাঁচবোই বা কি করে? না খেতে-খেতে আর কিছুদিন বাদেই ত শেষ হয়ে যাবো! তাহলে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলা যাক এই জীবনপ্রদীপ নিবিয়ে দেবার কাজটা। নীচের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম টেমস্ নদী। টেমসের জলে এখানটা বেশ বড়-বড় পাথর রয়েছে। উপর থেকে ওই পাথরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে মাথা ফাটবেই, দেহটাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ! ব্যস, আর কিছু মনে নেই তারপর! বোধশক্তি সব হারিয়ে ফেলেছি। রেলিং এর উপর একটা পা তুলে ব্রিজের উপর থেকে লাফানোর ঝোঁকটা নিতেই কাঁধের উপর এসে পড়লো কার একটা হাত। চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ পুলিশ।

এখন আমি কি করবো? মহাসমস্যা ! কিন্তু কী আশ্চর্য, পুলিশটি যেন কতকালের চেনা , কাঁধে হাত দিয়ে বন্ধুর মত জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি ভারতীয়, বন্ধু? এই ব্রিজের উপর জায়গাটা বেশ সুন্দর, না?

আমি কী জবাব দেবো-ভেবে পেলাম না। কোথা থেকে ও এলো? ও কি জানে যে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম? ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে ও এলো কেমন করে? তাহলে কি ও এতক্ষণ নজর রাখছিল আমার উপর? তবে তো ও আমাকে এক্ষুণি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। কেননা আত্মহত্যা দন্ডনীয় অপরাধ।

এসব ভেবে ভয়ে কি বলবো বুঝে উঠলাম না। আমার সেই হতভম্ব ভাব দেখেই বোধহয় ও বললো, 'বসুন স্যার, চা খেতে-খেতে আমরা গল্প করি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। আমার বাবা ওখানে ছিলেন অনেকদিন।'

অবাক হয়ে ভাবলাম–এ কেমন পুলিশ? এত দরদ নিয়ে সহানুভূতির সুরে ও কথা বলছে কেন? যাই হোক আমরা একটা কফির দোকানে এলাম। কফির সঙ্গে কিছু খাবারও অর্ডার দিল পুলিশটা। খাবার দোকানে ঢুকে আবার অনুভব করলাম যে বড় খিদে পেয়েছে, কিন্তু পয়সা নেই। যাই হোক, কথায়-কথায় ও জানল আমার লণ্ডনে আসার কারণ। স্যার রদেনস্টাইনের কথা বলতেই ও উচ্ছসিত হয়ে উঠলো–সেই মহান শিল্পীর উদ্দেশ্যে।

তারপর যখন বললাম যে, আমি পাবলোভার ব্যালেতে অংশ নিয়েছি, তখন ও প্রায় লাফিয়ে উঠলো।

এমনি ঘরোয়া কথাবার্তায় আমরা বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। ও জানতে চাইলো– আমি কোথায় থাকি? ঠিকানা লিখে নিয়ে বললো, একদিন নিশ্চয়ই আসবে সে আমার বাড়িতে। ওর নাম রবার্ট। বড় মিষ্টি স্বভাব ওর। সেদিন কফির দোকান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম বাড়ি। নিজের মনটা যেন অপেক্ষাকৃত ঝরঝরে মনে হলো। অবসাদের কালো মেঘটা মনের উপর থেকে সরে গেছে। সেদিন অত গল্প করলো আমার সঙ্গে রবার্ট, কিন্তু আমি যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য ও করলো না। বাড়িতে এসে বললাম আমার দুঃসময়ের মাতৃসমা ল্যান্ডলেডিকে–রবার্টের কথা!

সত্যি-সত্যিই কয়েকদিন পরে এলো রবার্ট। সেদিন এলো সাদা পোশাকে। ওকে এত সুন্দর লাগছিল দেখতে এই পোশাকে, দেখে মা খুব খুশি হলেন। রবার্ট পড়াশুনায় বেশী আগ্রহী। তাছাড়া লন্ডনের পুলিশ এব্যাপারে পৃথিবী বিখ্যাত। প্রত্যেকে ওরা শিক্ষিত–গ্রাজুয়েট। সাধারণ জ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এগুলির যথাযথ ট্রেনিংও ওদের নিতে হয়। পরিস্কার ঝকঝকে পোষাক, স্মার্ট চেহারা ওদের। মনে হয় যেন প্রত্যেকেই সমান লম্বা। আর তারা যেন হাঁটেও একরকমভাবে। সেদিন আমাদের বাড়িতে বসে নানান কথার পর আমি ওকে বললাম যে, ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের উপর সেদিন আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম এবং তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছো। শুনে রবার্ট হেসে বললো, 'জানি, বন্ধু, জানি। অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে আমি লক্ষ্য করছিলাম।'

ওর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবে কেন ও আমাকে অ্যারেস্ট করলো না?

যাই হোক, আমি রবার্টের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। তাছাড়া ওর ব্যবহারে আমার মনের আবহাওয়াটাও যেন অনেক পরিস্কার হয়ে গেল।

দাদা বলে চললেন "এরপর আবার কাজের চেষ্টা। কিন্তু কোথাও যেন ভরসা পাচ্ছি না। আমেরিকা যাবার আগে আমার আঁকার সরঞ্জাম, আমার সেলফ পোট্রেটটি এবং কিছু দামী জিনিস ভেরাদের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ভেরার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর ওগুলো আমার আর ফিরিয়ে আনা হয়নি। সেলফ্ পোট্রেট্টার জন্য দুঃখ করিনা। তবে অনেক ক্যানভাস, অনেক রং-তুলি ছিল, সেগুলো পেলে হয়তো ছবি এঁকে তা বিক্রি করেও কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারতাম। কারণ নতুন করে-ওসব কিনে কিছু করার সামর্থ্য তখন আমার ছিলনা।

রাসলীলার ছবিটা ভাগ্যক্রমে আমার এক বন্ধুর কাছে ছিল। সে-ছবিটা ষাট পাউন্ডের বিনিময়ে মহারাজা অব জাম সাহেবের কাছে বিক্রি করি। সেই ষাট পাউন্ডে অনেক পাওনা মিটিয়ে কয়েকদিন একটু পেট ভরে খেয়ে কেটেছে।

আমেরিকা যাবার আগে শকি ও অ্যাডালেটের সঙ্গে কথা হয়েছিল নাচের বিষয়ে। ওরা এখন সেবিষয়ে কীভাবে, তা

জানবার জন্য বেরোলাম। আমার এই অবস্থায় কি ওরা আমার সংগে কাজ করতে রাজি হবে?

শকি ও অ্যাডালেটদের বাড়িতে পৌছে ওদের সাদর অভ্যর্থনায় আমি অভিভূত। বাড়িতে ওদের বাবা মি: ল্যানফ্লাঙ্কি, শকি, অ্যাডালেট, ও শকির ছোটছেলে থাকেন। মি: ল্যাঙ্কফ্লাঙ্কির মধুর ব্যবহার আমি ভুলবো না।

প্রথমেই আমার এই দৈন্যদশার কথা ওদের কাছে বলতে কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করছিলাম। কিন্তু আমার ইতস্তত: ভাব দেখেই বোধ হয় ওরা সব বুঝতে পারলো। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম–তাদের ব্যবহার যেন আরো মোলায়েম হয়ে এলো। মি: ল্যাংকফ্লাঙ্কি উচ্ছসিত হয়ে বললেন, 'তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি আমার মেয়েদের মুখে। খুব ভাল কথা যে, তুমি নিজস্ব দল নিয়ে এদেশে তোমাদের দেশের নাচ দেখাবে। শুনেছি যে, তোমাদের দেশের নাচের আলাদা একটা আবেদন আছে। আমার মেয়েরা তো তোমার দলে কাজ করার জন্য বড়ই আগ্রহী।'

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তাদের সহৃদয় ব্যবহারে। জানতে পারলাম–শকি আর অ্যাডালেটের একটা স্টুডিয়ো আছে। সেখানে তারা ব্যালে শেখায়। ভারতীয় নাচে ওদের বরাবরই আগ্রহ। তাই ঠিক হলো যে, ওদের ব্যালের ক্লাসের পর ঐ স্টুডিয়োতেই ওরা আমার কাছে নাচ শিখবে।

বিদেশে যেমন আমি বিপদে পড়েছি, তেমনি সেই বিপদের দিনে ভগবানের আশীর্বাদে বন্ধুও পেয়েছি।

ওরা প্রায়ই আমাকে কাজের পর ওদের বাড়িতে খেতে ডাকতো। আর স্টুডিয়োতে চলতো প্রত্যহ কাজ। এমনিভাবে চললো কিছুদিন। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশ: বুঝতে পারছিলাম যে গোটা দল এখনই তৈরি করা সম্ভব নয়। মাথায় এলো–তিনজনে শো দিলে কেমন হয়? কিন্তু তিনজন মিলে তা কোন হলে বা থিয়েটারে পুরো শো দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অনেক আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করতে হয়। সে-সব আমার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।

কিন্তু উপার্জন করতেই হবে। এভাবে আর কতোদিন চলবে? এক রকম মরিয়া হয়েই উঠেছিলাম। যেখানেই হোক, যেভাবে হোক শো দিতে হবে।

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাই ঠিক করলাম হোটেলের ক্যাবারেতেই নাচ করবো। এ ধরনের হোটেলগুলি সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার নেই। এর আগে যে নাইট ক্লাবে আমি একা নাচ করেছিলাম, তার দর্শকরা সবাই সম্ভ্রান্ত। কিন্তু মামুলি হোটেলের ক্যাবারেতে সাধারণের সংখ্যাই বেশি। তারা কি আমার এই নাচ ভালভাবে নেবে?

ক্যাবারেতে যারা নাচ দেখাতে আসে, তারা কী ধরনের নাচ পছন্দ করে সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু সেদিন, আমি এমনি কোন নাচ-এর পরিকল্পনা করিনি। মনের মধ্যে এলো ছোটবেলায় দেখা ডারীদের ছবি। কাঁধেতে বাঁশের বাঁকের দুই মাথায় দড়ি দিয়ে বাঁধা জলের কলসী। তারা বয়ে নিয়ে যেতো। তাদের চলার গতি, ভঙ্গী, সবকিছু মিলিয়ে বেশ একটা ছন্দোময় অভিব্যক্তি ছিল।

এই জলবহনকারী নাচের পোশাকও বড় সাধারণ। হাঁটুর উপর কাপড় পরা, খালি পা, আর পায়ে ঘুঙুর। এ-নাচটা আমার একার ছিল। শকি আর অ্যাডালেটের–এর পর এক সংগে একটা নাচ ছিল। আর সব শেষে তিনজনে মিলে একটা নাচ।'

এই শেষের নাচটার বিষয়বস্তু কি ছিল সেকথা দাদাকে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন যে, লোকনৃত্যের মতো। কিন্তু পুরোটা মনে নেই। দাদার কাছেই শুনলাম যে,এই জলবহনকারী নাচে কাঁধও হাতের কাজ বেশি ছিল এবং এই নাচের থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত 'ইন্দ্র' নাচের সূচনা হয়। উপযুক্ত মিউজিক ও কসটিউমের সমন্বয়ে যথাসময়ে রূপ পেয়েছিল ইন্দ্র নাচ।

পিকাডিলির কাছেই যে হোটেলে ট্রিওর প্রথম শো দেওয়ার কথা ঠিক হলো, তার নাম এডওয়ার্ড হোটেল। নতুন আর্টিস্টদের সুযোগ দেওয়ার সুযোগটুকু সে হোটেলের ম্যানেজার ঠিকই গ্রহণ করেছিলেন। হোটেলের ক্যাবারের আবহাওয়ার মধ্যে ট্রিওর নাচ কিছুক্ষণের জন্য পরিবেশে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। আর সেই বৈচিত্র্যটুকুর কথা ভেবেই ম্যানেজার নিতে রাজি হয়েছিলেন এই ট্রিওকে। এবং ট্রিওকে নিযুক্ত করেছিলেন সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। তিনজনের জন্য তিন পাউন্ড।

তবু তিন পাউন্ড আসবে হাতে এই ভেবেই কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এই তিন পাউন্ড আসবার আশাটাও হঠাৎই মিলিয়ে গেল। কারণ ট্রিওর প্রথম নাচ 'ওয়াটার কেরিয়ার' হবার পর যথেষ্ট করতালি পড়লেও কেউ বোধহয় অনুযোগ করেছিল ম্যানেজারের কাছে। আর সেই অভিযোগের জন্য প্রথম রাতই হলো শেষ রাত এডওয়ার্ড হোটেলে। ওখানকার চাকরিটি খোয়াল ট্রিও।

কিন্তু কী অভিযোগ ছিল সেদিন দাদার বিরুদ্ধে, সেকথা জানতে চাইলে দাদা হেসে বললেন, 'বুঝতে পারলি না বোকা মেয়ে? আমি যে তখন বড় রোগা হয়ে গিয়েছিলাম। হাড় বের করা চেহারা দেখতে কার ভাল লাগে বল? ক্যাবারেতে খরিদ্দারেরা আসে আনন্দ করতে, খাওয়া-দাওয়া করে স্ফূর্তি করতে, সেখানে যদি একটা লিকলিকে লোক নাচ করে, ভাল লাগবে কেন?

আমার ওয়াটার কেরিয়ার নাচের পর ম্যানেজারটি আমার হাতে এক পাউন্ড ধরিয়ে দিয়ে ঐ কথা শুনিয়েছিল। আমার রোগা চেহারা দেখে খরিদ্দারদের অসুস্থবোধ হতে পারে। তবে মেয়েদের বেলা ওসব কোন অভিযোগ নেই। তারা তাদের নাচটি যথারীতি করে যেতে পারে। তাদের চাকরি থাকবে। কিন্তু আমার আর ওখানে কাজ চলবে না। ম্যানেজারের কথা শুনে সেদিন কেমন মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারিস? ওপরে ড্রেসিংরুমে এসে শকি, অ্যাডালেটকে বললাম সে-কথা। ওরা পোশাক-পরিচ্ছদ পরছিল ওদের নাঁচের জন্য,–নীচে অ্যানাউনসার অ্যানাউনস্ করছে ওদের নাম। কিন্তু আমার কথা শুনে দুবোনেই কাঁদতে শুরু করলো এবং নাচের পোশাক ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরে নিল। আমার চাকরি না থাকলে ওরাও নাকি সেখানে নাচ করবে না। ওদের দরদী মনের স্পর্শে আমারও সেদিন কান্না এসেগিয়েছিল। আমরা বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। হাতের স্যুটকেসে কসটিউম এবং পারিশ্রমিক বাবদ একটি পাউন্ড।

আবার ভাবনা কী হবে? এঘটনার পর ওরা ঠিক করলো প্যারিসে যাবে। সেখানকার পরিবেশ একেবারেই আলাদা। সেখানে গেলে কোন না কোন কাজের যোগাড় হবেই হবে।''

এরপর শকি আর অ্যাডালেট চলে গেল প্যারিস। দাদার সংগে তাদের ঠিক হয় যে, প্যারিস থেকে ওরা চিঠি লিখবে এবং সেই চিঠি পেয়ে দাদা যাবেন প্যারিস।

যতদিন না চিঠি আসে ততদিন দাদা থাকবেন লন্ডনে। লন্ডনে থাকা মানেই দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম। প্যারিসে গেলেই যে রাতারাতি রাজা হয়ে যাওয়া যায় তা নয়।

পয়সা ছাড়া লন্ডনে থাকা নাকি বিভীষিকা। কথাটা দাদার কাছেই শুনেছি। দাদা বলতেন, 'একটা প্রবাদ আছে, উইদাউট মানি লন্ডন ইজ হেল' তায় আবার বিদেশী, ভারতীয়। ইংরেজরা বড় স্টিফ কলার জাত। বিশেষ করে লন্ডনের ইংরেজরা। কিন্তু প্যারিসে যখন কাজের জন্য ঘুরে বেড়াতাম, তখন সর্বদাই ফরাসি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা দেখা হলে 'বনজুর মঁসিয়ো' বলে অভিবাদন করতেন। বিদেশিদের তাঁরা আরো বেশি করে বলতেন। সেখানে চারদিকেই একটা সহৃদয়তার ছাপ চোখে পড়ে। ওরা বড় আপন করে নেয় বিদেশিদের। তাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার, তাদের কথাবার্তার ধরণ সেই দুঃখের দিনেও মনটাকে বেশ চাঙ্গা করে দিত।

যাই হোক, ওরা দু'জন প্যারিস চলে যাবার পর আমি একা 'হিপোড্রম' মিউজিক হলে নাচ করি। 'সোর্ড ডান্স' এবং আর একটি ছোট নাচ করতাম। তবে এবার আর খালি গায়ে নয়। জ্যাকেট পরে অথবা উত্তরীয়র মতো কিছু একটা গায়ে দিয়ে নিয়েছিলাম। এবার যে সামান্য কিছু রোজগার হলো, তাই দিয়ে প্যারিসে রওনা হবার আগের একমাস কোনরকমে কাটালো। বন্ধকের দোকান থেকে দু একটি প্রিয় স্যুট ও পাবলোভার দেওয়া ঘড়িটি মুক্ত করে নিয়ে এলাম। অ্যাডালেটের চিঠি এসে গেল। মিঃ ল্যাংকফ্রাঙ্কির সঙ্গে ওরা ঠিক করেছে যে, আমার পথ খরচার বাবদ তিন পাউন্ড উনি আপাতত: দেবেন আমাকে।

যাওয়ার ব্যবস্থা তো একরকম হলো। কিন্তু লণ্ডন ছেড়ে প্যারিস যাবার আগে আমার ঘর ভাড়ার টাকাটা তো মিটাতে হবে। দু'তিন মাসের ঘরভাড়া বাকি পড়ে আছে। কথায় কথায় আমার ল্যান্ডলেডিকে বলেছিলাম—প্যারিসে গিয়ে কাজের চেষ্টা করার কথা। সে কথা শুনে তিনি বারবার আমায় উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, 'প্যারিসে নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে। তুমি সফল হবে। 'মাই সন অ্যাই উইশ ইউ বেস্ট অব লাক' এহেন শুভাকাঙ্খিনীকে কি করে আমার অক্ষমতার কথা জানাই যে তাঁর পাওনা মেটানোর মত টাকা আমার নেই? তবুও বলতেই হলো। সেকথা শুনে এ সমস্যার তিনি যে সুন্দর সমাধান করে দিলেন তা একমাত্র তাঁর মত স্নেহময়ী মা-এর পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন, 'সন্তান যখন স্বাবলম্বী হবার জন্য চাকরির চেষ্টায় বিদেশে যেতে চায়, তখন কি তার মায়ের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব কষার সময়? কৃতজ্ঞতা, চোখের জল, আর আনন্দের মধ্য দিয়ে মাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্যারিসে এসে পৌঁছলাম। শকি, অ্যাডালেট স্টেশনে এসেছিল। রুল্যা-ফায়েৎ অঞ্চলের একটি বড় ফ্ল্যাট বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথম দিন থেকেই প্যারিস যেন মন কেড়ে নিয়েছিল আমার। শহরটির মধ্যে কোথায় যেন অনুপ্রেরণা বা উৎসাহের যোগান ছিল। তাই এখানে এসেই আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম চাকরির। যদিও মাঝে মাঝে সময় পেলেই চলে যেতাম ওখানকার বিখ্যাত মিউজিয়াম ও আর্টগ্যালারিতে। তবুও বেশির ভাগ সময় কাটতো কাজেরই চেষ্টায়। দিনের পর দিন অডিশান দিয়ে ছোট-ছোট কাজ যোগাড়ও হলো। কিন্তু গরজ বুঝে খুব কম মাইনাতে আমাদের নিয়োগ করতো।

সে সময় কোথায় নাচ করছি, কেমন দর্শক, কত পারিশ্রমিক পাবো—এসব ভাববার মত মনের অবস্থা নয়। কাজ চাই এবং কাজ পেলে সে-কাজটাকে মনপ্রাণ দিয়ে করতে পারাটাই তখন আমার একমাত্র লক্ষ্য। ক্যাবারের দর্শকদের বিবরণ আর কেমন হবে? কেউ হয়তো এতই মদ খেয়েছে যে মুখ হাঁ করে বসে আছে, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। কেউ বা তাদের সঙ্গী-সঙ্গীনির সঙ্গে এতই প্রমত্ত যে, কোনদিকে নজর নেই। আবার কোন টেবিলে এত হৈ-হল্লা হচ্ছে যে, বলা যায় না। এই পরিবেশে নাচের সময় আমার কি মনে পড়তো না যে, লণ্ডনের কভেন্ট গার্ডেনের বিখ্যাত রয়াল অপেরা হাউসে এবং আমেরিকার বড় থিয়েটারে ও অপেরায় বিশ্ববিখ্যাত পাবলোভার সঙ্গে অভিজাত দর্শকদের সামনে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে এই আমিই একদিন নাচ করেছি। সেই অভিজ্ঞতার পর ক্যাবারের এই অভিজ্ঞতা, এ বড় অদ্ভুত সমন্বয় আমার জীবনে।

যাইহোক, ক্যাবারের অভিজ্ঞ দর্শকদের অভ্যস্ত চোখে ভারতীয় নাচ ও পোশাকের এই বৈচিত্রটুকু নিশ্চয়ই ভালো লাগতো। আর তাই আমাদের চাকরিও টিকে থাকলো। কিন্তু ছোট-ছোট ক্যাবারেগুলিতে স্বভাবিক কারণেই পারিশ্রমিকের অঙ্ক কম হতো।

তাই আমরা নিজেরাই চেষ্টা করলাম অন্যান্য অনেক জায়গায়,— একটু বড় ক্যাবারেতে। এই সময়টায় কোন-কোন জায়গায় আমাদের তিন জনেরই কাজ হতো। কোথাও শুধু ওদের চাইতো, আর কোথাও বা শুধু আমাকে। প্রথম ট্রিও-র তিনটি মেম্বারের আলাদা-আলাদা কাজ করাটাকে আমরা আমল দিইনি। কিন্তু বাস্তবতার ঘা খেয়ে আমরা ঠিক করলাম যে ট্রিও ঠিক থাকবে উপার্জিত অর্থের বেলায়। আলাদা-আলাদা জায়গায় আলাদাভাবে কাজ করলেও আমরা টাকা-পয়সা জমা করতাম একই তহবিলে।

এইভাবে দিন চলতে লাগলো। ট্রিওর মধ্যে কারও না কারও চাকরি ঠিক আছে। এইভাবে 'দিন আনি, দিন খাই' বেশ চললো কিছুদিন। ক্যাবারেতে সারারাত কাজ করতে হয়। স্বভাবতই শকি ও অ্যাডালেট শ্রান্ত হয়ে পড়তো। কাজে যাবার সময় শকির তিন বছরের বাচ্চাটাকে বাড়িতেই তালাবন্ধ করে রেখে চলে যেতাম আমরা। সকালবেলা বাড়ি ফিরে সেই ছোট্ট ছেলেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে, দুধ খাইয়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তাম। শকি, অ্যাডালেট এসময়টা ঘুমাতো। বাচ্চাটা আমাকে 'আঙ্কেল' বলে ডাকতো। ভারি মিষ্টি ছিল বাচ্চাটা। ছোট-ছোট হাত-পা। আমার সঙ্গেই যেন ওর বেশি ভাব। বড় কষ্ট হতো ওর জন্য,— বেচারি! তাই সারারাতের শ্রান্তি আমারও শরীরে থাকা সত্ত্বেও সকালবেলা কাছের পার্কে নিয়ে যেতাম বাচ্চাটাকে। ফরাসী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা হাসিমুখে প্রশ্ন করতেন বাচ্চাটাকে, আমি তার বাবা কিনা! আমি ওদের হেসে বলতাম যে, আমার বন্ধুর ছেলে ও।

ছেলেটির জন্মবৃত্তান্ত বড় অদ্ভুত। শকি পাবলোভার দলে অনেকদিন থেকেই কাজ করতো। কয়েক বছর আগে এক আমেরিকান ট্যুরে গিয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে শকির পিঠের হাড় ভেঙ্গে যায়। পথে ট্যাক্সির সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমেরিকাতেই হাসপাতালে থাকার সময় ডাক্তারের এক বন্ধুর সঙ্গে শকির আলাপ হয়। ভদ্রলোক বেশ বয়স্ক। সেই ভদ্রলোকটিই এই শিশুর পিতা। কোন কারণে তাদের বিবাহ সম্ভব না হওয়ায় শকি চলে আসে বাচ্চাকে নিয়ে মিঃ ল্যানফ্রাঙ্কির কাছে। কিন্তু ভদ্রলোক সানন্দে ও স্বেচ্ছায় বাচ্চাটির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে চলেছেন।

গোস্তাকি মাফ করবেন দাদা

আবু হোসেন

পৌষালী সন্ধ্যায় সদর সড়কের মোহনায় একটা মধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁয় ঢুকে বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়েছি, তারপরে একটা খালি টেবিলের আর একটা চেয়ারের ঘন্টা-খানেকের ইজারা নিয়ে সবে বসেছি। অমনি সেখানে ঝড়ের বেগে এসে সেঁদোলেন আমার স্বনামধন্য সাহিত্যিক দাদা। তাঁর শরীরের গতি বেয়ারার হাতেও সঞ্চালিত হয়ে কয়েক চামচ চা চলকে পড়লো।

দাদা রীতিমত হাঁফাচ্ছেন। বৃদ্ধ মানুষ বাড়ি থেকে পোয়াটাক রাস্তা হেঁটেই হাঁফিয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে। আমি তো হতভম্ব। এক অজানা ভয়ের আশঙ্কায় আমার পালস বীট বেড়ে গেলো। তাঁকে দেখতে পাওয়া মাত্র আমারই টেবিলের সামনে খালি চেয়ারে বসতে অনুরোধ করে জিজ্ঞেস করলুম।

– ব্যাপারটা কি, দাদা? – দাদা হাতে অভয়মুদ্রা পয়দা করে বুঝিয়ে দিলেন, বলছি, একটু সময় দাও। – কুড়ি সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর বললেন,

– ওরা আমাকে ফলো করছে কিনা আগে দেখে আসি -- বলেই উঠে রেস্তোরাঁর দোরগড়ায় গিয়ে বাইরে ভালো করে দেখে নিয়ে ফিরে এসে আমার সামনের চেয়ারখানি দখল করতেই আমি ভয়ার্তকন্ঠে জিজ্ঞেস করলুম,

– ওরা কারা? – দাদা ইতিউতি চাইলেন। আমি আসমান-জমিনে জাল ফেলে বোঝবার চেষ্টা চালালুম, কী বিপদ হতে পারে। তবে কি গুণ্ডারা ওঁকে দুনিয়ার বার করবার বন্দোবস্ত করছে? দিনকাল ভালো না। কিন্তু একজন বৃদ্ধকে মেরে কী লাভ?

দাদা রেস্তোরাঁয় উৎক্ষিপ্ত শব্দের জলে কান ডুবিয়ে বললেন,

– শুনতে পাচ্ছো, মাইকের আওয়াজ?

– হাঁ পাচ্ছি। বোধ হয় পার্টি মিটিং হচ্ছে, কদিন পরেই তো ভোট! – এখন সব পার্টি একই সুরে চেঁচাচ্ছে। শুনে বোঝাই যায় না কোন পার্টির মিটিং।

রাস্তা দিয়ে অনবরত ডাঁয়া-পার্টির বাঁয়া-পার্টির গাড়ি ছুটছে। শ্লোগানের তরঙ্গ রাস্তার দু-পাড়ে আছড়ে পড়ছে। স্ট্রীট কর্ণার মিটিং হচ্ছে। পানের দোকানী, কলা বিক্রেতা, ফুচকা-ওয়ালারাও গা গরম হয়ে ফুঁসছে। পার্টি ক্যাম্পেনের এখন পিক-আওয়ার। কিন্তু আমি ভাবছি, দাদা তো সাহিত্যিক। উনি এ সমস্ত পলিটিক্যাল শঙ্কাকে ডঙ্কা মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে দাদা ধাতস্ত হয়ে বললেন,

– মিটিংয়ের ভয়ে পালিয়ে এলুম। ওরা আমাকে আজ ধরে বেঁধে মঞ্চে তুলবার ষড়যন্ত্র ফেঁদেছে। আমাকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াবে। হুঁহ, রাত্তি আটটা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকছি।

আমি মনে মনে পুলক অনুভব করলুম। মুফতেসে আমার প্রিয় সাহিত্যিক দাদার সঙ্গলাভ -- সন্ধ্যেটা দারুণ জমবে! আমি বললুম,

– আপনি ওদের সাফ জানিয়ে দিতে পারতেন, আপনি যাবেন না ওদের মিটিংয়ে, বক্তৃতা দিতেও পারবেন না।

– আরে, ওরা শুনবে কেন?

– বারে, শুনবে না মানে? আপনার মতের বিরুদ্ধে -- ধমকে উঠলেন দাদা -- তুমি সবটা বুঝবে না ছোকরা -- বলে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। একথা অবিশ্যি ঠিক, ওনার বুঝ আর আমার বুঝ সমান হতে পারে না। আমি ওনার কোমরের বয়সী। তাছাড়া, ওনার জ্ঞানের, বিদ্যার পাত্র উপচে পড়ছে, আমার পাত্র ঠং ঠং বাজছে। দাদা বললেন, – জানো, এই ইলেকশনের সময়টা একজন আঁতেলেকতুয়েলের কাছে সংকটের সময়? একুয়েল এগজামিনের মতো। তুমি বাঁ-পথের লোক হয়ে যদি ডান-পথে সামান্যই হেলে পড়ো, অমনি মার্কেটে ঢিঁ ঢিঁ পড়ে যাবে। এই দেখোনা, -- বলেই উনি হাফ ডজন সাহিত্যিক কাম আঁতেলেকতুয়েলের নাম উল্লেখ করে ক্ষোভের সুরে বললেন,--

এরা সারা জীবন বাঁ পথের মুসাফির হয়ে এবারে কিনা ডানের মিটিংয়ে যোগ দিয়েছে! ভীমরতি ধরেছে এদের! ছি ছি! -- এদের বোকামীর জন্য দাদার মাথা কাটা যাচ্ছে দেখে আমারও দুঃখ হলো।

ইতিমধ্যে আমি ডায়াবিটিসের রুগী দাদার জন্য বিনি-চিনি চায়ের অর্ডার দিয়েছি। চাও এসে গেছে, দাদা গরম কাপের কানায় নরম ঠোঁট ঠেকিয়েছেন। আমি আমার মাথায় সাজানো চলন্তিকা ঘেঁটে দেখতে লাগলুম, 'ভীমরতির' শব্দার্থ কি? সাতাত্তর বছরের সাতমাসের সাততম রাত্রিতে বার্ধক্যহেতু বুদ্ধিভ্রম। কিন্তু ওই সাহিত্যিক কাম আঁতেলেকতুয়েলদের একজনের বয়েস আটের কোঠায়, একজনের ছয়ের কোঠায়, অন্যদের জানিনে। যাকগে, আমার ওসব বেশি ভেবে কি লাভ? দাদার সঙ্গে আমার একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে, এই যথেষ্ট। উনি আমাকে প্রশ্রয় দেন, আমাকে পাবলিকলি 'দাদা' বলে ডাকবার লাইসেন্স দিয়েছেন। ওঁর পৈত্রিক বাড়ি আমাদের পাশের গাঁয়ে। যদিও শেষ চারযুগ কালের মধ্যে ওর চরণরেণু ওই গাঁয়ের মাটিতে পড়েনি। ওঁর গায়ে এখন গাঁয়ের আঁশটে গন্ধ খুঁজতে গেলে হয়রাণ হয়ে ফিরতে হবে। অবিশ্যি দাদার সাহিত্যকীর্তির খাসমহলে আমার প্রবেশাধিকার নেই। আমার দৌড় বার-দুয়ার পর্যন্ত। তবে উনি খুব সম্মানিত ব্যক্তি তা বুঝি। ওনার কাছে হালহামেশা বিখ্যাত আধা-খ্যাত লোক আসে। ওঁর দিকে তাকালেই বুঝতে পারি, ওই দীর্ঘাঙ্গ কাশ্মীরী শালে মোড়া গা দিয়ে শ্বেন মণিমুক্তোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। ক'বছর আগে রবীন্দ্র সদনের সারস্বত সভায় উনি যে অনারটা পেয়েছিলেন, সেটা যেন কোহিনূর খচিত শিরোপার মতো ওঁর শিরে শোভা পাচ্ছে। দাদার পাশে থাকলে ওইসব হীরে জহরতের রোশনাই আমার মুখে এসে পড়ে, আমার মুখখানিও তখন বেশ জেল্লাদার হয়ে ওঠে।

হঠাৎ দাদার মাথার দিকে আমার চোখ পড়ল। শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধের মাথায় টুপি বা মাফলার নেই। তাই বললাম,

– আপনার মাথায় কিছু পরে বেরোনো উচিত ছিলো। ঠান্ডায় তো নিউমোনিয়া এ্যাটাক করতে পারে।

– মাথায় কিছু না পরলেও আমার ঠান্ডা লাগে না। পায়ে তো মোজা পরেছি -- বলে টেবিলের তলায় তাঁর মোজার ওপরে নিউকাট জুতো শোভিত পদযুগলের প্রতি আমার নজর আকর্ষণ করলো – 'লোক কতো বোকা, দেখো! ঠান্ডায় মাথা ঢাকে। আরে, ঠান্ডা আটকাবে তো পা ঢাকো! সর্দিকাশি শরীরের ভেতরে ঢোকার ফাঁক ফোঁকর খুঁজে পাবে না।

আমার পরামর্শটা বৃথা গেলো। দাদা হঠাৎ শারীরবিজ্ঞানছেড়ে অবতরণ করলেন ক্রিকেটের মাঠে। বললেন,

– জানো, কপিলকে দল থেকে বাদ দিয়েছে? এরা ক্রিকেটকে রিকেট রুগী না করে ছাড়বে না। আমি ভাবতেই পারছিনে, সকালে খবরটা পেপারে দেখা ইস্তক মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। –– কপিলের দুর্ভাগ্য আমিও ব্যথিত হলুম। মনে পড়লো, ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে এই টেস্ট সিরিজে ফিরোজ শা কোটলার মাঠে কপিল বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তাছাড়া, ক্রিকেটের কাপ্তানী নিয়ে নাকি অনেকদিন ধরেই সুনীলে কপিলে কপি যুদ্ধ চলছিলো। অবশ্য আমার ক্রিকেট-প্রীতি খানিকটা বে-রসিকের মার্গ সংগীত প্রীতির মতো। ক্রিকেট স্টারদের সঙ্গে আমার পরিচয় টিভির পর্দায় আর পত্রপত্রিকার খেলার পাতায়। ইডেনের সবুজ মখমলের মতো ঘাসে ঢাকা মাঠে আমার কখনোই গড়াগড়ি দিতে সাধ জাগেনা। তবে ভারতের খেলুড়ে দেশের মাটিতে হোক আর বিদেশের মাটিতে হোক, জিতলে আমার বুক গর্বে ফেঁপে ওঠে। হারলে ফোঁড়া ওঠার মতো যন্ত্রণায় টাটায়।

এদিকে গল্পে গল্পে ঘন্টাটাক ফুরিয়ে গেলো। আজ সন্ধ্যায় দাদার সঙ্গে দুটো ঘন্টা কাটিয়ে দেবার ম্যানেজারি পেয়েছি। বেয়ারাকে আরো এক কাপ চিনি-চা, এককাপ বিনি-চিনি চা দেবার অর্ডার পেশ করে ফের মনোযোগী হলাম গল্পে। এই রেস্তোরাটা আমার বিশেষ পছন্দ। তার একটা বিশেষ কারণ আছে। এখানে তুমি এক-কাপ চায়ের পয়সা পকেটে নিয়ে দিব্যি ঘন্টাটাক কাটাতে পারো। চা-পান শেষে বেয়ারা এসে তোমাকে খামোকা উঠিয়ে দেবার মতলব করে বলবে না –– স্যার, আর কিছু চাই?

দাদা বললেন, কপিলকে কেন দল থেকে বাদ দিয়েছে তার আসল কারণ জানো? –– সত্যি আমি কিছুই জানিনা, নিজের অজ্ঞতা মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিলাম। দাদা ফের বললেন,

কপিল যে ভুল করেছে, সুনীল অমন ভুল গণ্ডায় গণ্ডায় করেছে। অথচ সুনীলের বেলায় কোনো শাস্তি হয়নি। দেশটা জাত-পাত করে উচ্ছন্নে গেলো।

– দাদা, ক্রিকেটের সঙ্গে জাতপাতের কী সম্পর্ক?

– আরে, সুনীল হচ্ছে বামুনের ছেলে, কপিল অ-বমুনের ছেলে। আর ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ডের মোড় গুলো সব বামুন। বামুন-অবামুনের লড়াইয়ে কপিলের কপাল ভাঙলো। – কপিল হরিয়ানার ছেলে, সুনীল বম্বের ছেলে, এইটুকু মাত্র আমার জানা আছে। আর ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ডের কে কে আছেন সকলের নাম জানিনে। তবে বিষেণ বেদীর মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ী আছে। আর দাড়ি পাগড়ী থাকলে শিখ হয়। তাই দাদাকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

– দাদা, বেদীও কি বামুন? – দাদা ঝাঁঝি মেরে আমাকে দমিয়ে দিয়ে বললেন, দু-একজন কোনো ফ্যাক্টর নয়, মেজরিটি বামুন। কপিলের পতন হলো জাত-পাতের লড়াইয়ে হেরে গিয়ে, এই আমার লেটেস্ট থিয়োরী। আমি পেপারে একটা লিখবো। কোন বাংলা কাগজে লিখবো না, স্টেটসম্যানে লিখবো।দেশের সমস্ত লোকে জানুক, কপিল-পতনের গুপ্ত রহস্য।

আমার কেমন সন্দেহ হতে লাগলো, দাদাকে বাহাত্তুরে পায়নিতো? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। মাস খানেক আগেই ওঁর পঞ্চষ ট্টিতম জন্মদিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়ে গেলো। দাদা তখনোবলে চলেছেন,

– হিন্দু জাতটা জাত-পাত করেই গোল্লায় গেলো। তোমাদের মুসলমানদের মধ্যে ওসব নেই বেশ! তুমি তো গাঁয়ের ছেলে। গাঁয়ে যাও, দেখবে একটা বামুনপাড়া, ওটা কায়েতপাড়া, সেটা মুচিপাড়া এইসব। কিন্তু তোমাদের পাড়ায় কেউ থাক, বলবে মুসলমান পাড়া। বেশ! –– দাদা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। একজন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির ইগোয় সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। বেশ লাগছে! দাদা হক কথা বলেছেন। কিন্তু পর মুহূর্তে কেমন ধন্দের খন্দে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলুম। বললুম, – – দাদা, মুসলমানদের মধ্যে জাতপাত নেই একথা বুক ঠুকে বলা যায়? আপনি সমস্ত মজহারের মুসলমানের একজামাতে নামাজ পড়াটাওদেখতে পাবেননা। আমাদের মধ্যেও জাতপাত আছে, শুধু পার্সেন্টেজের হেরফের। হয়তো সেভেন্টি থার্টি হবে। শিয়া-সুন্নীর খুন খারাবীটা দেখেন না? কোনো শেখ সৈয়দ বা কাজী তার মেয়েকে কি বিনা দ্বিধায় কলু বা জোলার ছেলের হাতে তুলে দেবে? আমি পুরুলিয়ার বাগমুন্ডিতে কিছুকাল কাটিয়ে-ছিলাম। সেখানে দেখেছিলুম, এক কালালের ছেলে এক পাঠানের মেয়ের মহব্বতে পড়ে তাকে শাদি করে বাঁদী বানাতে চেয়েছিলো বলে সেখানে এক আধা-কম্যুনাল রায়ট লেগে যায় আর কি! গোস্তাকি মাফ করবেন দাদা, আমি ছোকরাত্তর বয়েসে এক শেখের মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেতে বসেছিলুম। তাকে শাদি করতে চেয়ে শেষে দিলে মোক্ষম চোট পেয়েছিলুম। সে জখমে অনেক মলম লাগিয়েও সারেনি। –– এই পর্যন্ত বলে ফেলে সামলে নিয়ে মুখের ছিপি বন্ধ করে ফেললুম। ছি, ছি, নিজের কওমের বদনামী করছি? জাতভাইরা আমার এই কওম বিরোধী মানসিকতা জানতে পারলে পিটিয়ে হাড়ে-গর্দানে এক করে তক্তা বানাবে। তাছাড়া, নিজের কেচ্ছা –– ছি ছি ছি। মনে মনে লজ্জিত হয়ে তওবা তওবা তওবা পড়ে নিলুম।

দাদা আমার লম্বা লেকচার শুনে গুম মেরে রইলেন কিছুক্ষণ। দূরে মাইকের গর্জন অল্প অল্প কানে আসছে। দাদা বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, দেশটা সকলে মিলে রসাতলে পাঠাচ্ছে। নোংরা পলিটিক্সে পরিবেশ দূষিত হয়ে গেছে। এই দেশে কি মানুষ বাস করতে পারে? সৎ লোক পলিটিক্সের ছায়া মাড়ায় না। হঠাৎ আমার মেজাজ খাঁ করে চড়ে গেলো –– দাদা, অসৎ লোকরাই যদি শুধু পলিটিক্সে আসে তাহলে সত্যিই একদিন দেশটায় রাজনৈতিক দূষণ ঘটে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তখন ভূপালে যেমন মিক না ফসজি বিষক্রিয়ায় বেঁচে যাওয়া লোকগুলো শহর ছেড়ে পালিয়েছিল, আমাদেরও কি তেমনি দেশ ছেড়ে পালাতে হবে? কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায়, অন্য দেশেও যে কত রকমের বিষক্রিয়া ঘটে আছে। তাহলে চাঁদায় বা শুক্রনিবাসের উদ্দেশে পাড়ি জমাতে হবে। কিন্তু সেখানের জমিন তো আদম সন্তানের বাসোপযোগী নয়। বরং আমাদের এই দেশটায় দূষণ নিউট্রালাইজ করার জন্য আজ অবশ্য প্রয়োজন রাজনীতিতে সৎ অ-ধান্দাবাজ লোক।––

দাদা আমার গো-বেচারা মুখে এত টরটরে কথা পছন্দ করতেন না, বুঝতে পারছি। বললুম, গোস্তাকি মাফ করবেন দাদা –– আমার মাথায় একটা পোকা ঢুকে কুরকুর করে কাটছিলো। সেই এসব কথা আমার মুখ দিয়ে বলিয়েছে। চলুন, আটটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি –– বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। □

পটকা-তত্ত্ব

ভূপেন্দ্র মোহন সরকার

বৈজ্ঞানিক এবারঘড়ির দিকে তাকাইলেন। তিনটা আর মাত্র ঘণ্টা দুই রাত্রি অবশিষ্ট আছে। এক পাশে খাবার ঢাকা আছে। দেখিলেন। উঠিয়া খাইতে বসিলেন। বড় বড় ডেলা পাকাইয়া গিলিতে গিলিতে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

উঠিয়া যন্ত্রপাতির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শরীর বিদ্রোহ করিতেছে। দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া প্রচণ্ড হাই তুলিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গেল। মোটা বইয়ের উপর রুমাল রাখিয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন।

সকালে ধড়মড় করিয়া যখন উঠিলেন, তখন প্রায় আটটা। চারিদিকে রৌদ্র যেন দাঁত বাহির করিয়ে ভেঙচাইতেছে। স্ত্রীর হাত হইতে চায়ের বাটি লইয়া চুমুক দিলেন।

অপরূপা উচ্চ হাস্যে বাধা দিলেন। – দুধ নয়, চা। জানি। – বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় চুমুকে শেষ করিলেন। আমি না হয় বাদই গেলাম, শরীরটা আছে তো? – অপরূপা অভিমান ভরে বলিলেন।

বৈজ্ঞানিক একটা মুখভঙ্গী করিলেন।

মুখ হাত ধুয়ে, একটু বাইরে থেকে ঘুরে এস

তাই যাব।

অপরূপা একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওটা হয়েছে? না। কিন্তু হবে। বৈজ্ঞানিক গা ঝাড়া দিয়ে উঠিলেন।

বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।

রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোক-চলাচল বৃদ্ধি পাইতেছে। সূর্যতাপের সঙ্গে জীবনের গতিমান উঠানামা করে, বৈজ্ঞানিক ভাবিলেন। কিন্তু গত রাত্রি তিনটা পর্যন্ত রৌদ্র ছিল না তো? তাঁহার জীবনবেগ তখন বাড়িল কি করিয়া?

ওটা বেগ নয়, আবেগ সম্ভবত। – মনে মনে মীমাংসা করিলেন। বৈজ্ঞানিক ক্রমে দার্শনিকে রূপান্তরিত হইতেছেন।

এই-এই! এই গাড়োয়ান! – সহসা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধমক দিয় উঠিলে ন।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ান গতিবৃদ্ধির প্রয়াসে নির্বাক গরু দুইটিকে উপর্যুপরি পিটাইতেছিল। অমানুষিক অত্যাচার। বৈজ্ঞানিক সহ্য করিতে পারিলেন না। আচ্ছমত ধমকাইয়া দিলেন।

নদীর পারে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াইলেন। হয় নাই, কিন্তু হইবে। আর একবার মনে মনে জবাব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে আবার বেগ সঞ্চারিত হইল। হাঁটিতে শুরু করিলেন।

বাড়ি ফিরিলেন।

খবরের কাগজের বড় হরফের খবরগুলি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অসীম বিরক্তি ভরে ফেলিয়া দিলেন। রাবিশ।

অপরূপা কাগজটা তুলিয়া রাখিলেন। কোন খবরটা রাবিশ? – হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

সবটা। আগাগোড়া।

ডাকাতির খবরটা পড়েছ?

ডাকাতি?

পড়নি তা হলে? উঃ, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! – অপরূপা সত্যই শিহরিয়া উঠিলেন। – একটা প্রাণীকেও রাখেনি। না রেখে বুদ্ধির কাজ করেছে। একজন বেঁচে থাকলে সে অশেষ দুঃখ পেত। -- বৈজ্ঞানিক উঠিয়া পড়িলেন। কি বলছ তুমি? এত নিষ্ঠুর কেন তুমি?

কোথায় হয়েছে?

বিহারের কি একটা গ্রামে।

সে তো এখান থেকে অনেক দূর। নয় কি?

ও, দূর বলে?

জবাব না দিয়ে বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে ঢুকিলেন। দুপুরবেলা খাইতে দিয়া অপরূপা পাখা লইয়া কাছে বসিলেন গ্রাস কয়েক খাওয়ার পরে সুযোগ মত আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার কাছে বলবে না?

বৈজ্ঞানিক মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তোমার আবিষ্কারের কথা? ভাবছ, বুঝব না আমি? বৈজ্ঞানিক মুখের ভিতর হইত মাছের কাঁটা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, পটকা।

পটকা?

বাজিরপটকা?

বৈজ্ঞানিক হাস্য করিলেন। -- বাজিই বটে। তবে বাজির পটকায় মানুষ মরে না। আমার পটকায় একটাতে এক হাজার মানুষ এক এক মিনিটে শেষ হয়ে যাবে। অপরূপা চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। – সে কি গো? জানতুম, তুমি সহ্য করতে পারবে না, সেই জন্যই আগে বলিনি। কিন্তু এমন সর্বনাশা কাজ কেন করছ? এত মানুষ একসঙ্গে মারবার এত কি দরকার তোমার?

বৈজ্ঞানিক আবার হাসিলেন। বদ্ধ পাগল। আমি মারতে যাব কেন?

তবে কে মারবে?

মূর্খের মত কথা বল না তো? – বৈজ্ঞানিক তাতিয়া উঠিলেন। – মারতে যাব কেন? মরে কি না – তারই নাম আবিষ্কার। তুমি বুঝবে না।

অপরূপা ব্যথিত দৃষ্টিতে অবোধের মত ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, মরে কিনা বোঝা যাবে কি করে?

মেরে।

মানুষ। এক হাজার মানুষ? – অপরূপার চক্ষু যেন কপালে উঠিয়া গেল।

তুমি অবোধ একেবারে। -- বৈজ্ঞানিক খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলেন।

রাত্রি বারোটায় অপরূপা ল্যাবরেটরিতে

ঢুকিয়া বলিলেন, শুতে চল।

তুমি শোওগে আমার দেরি হবে। -- বৈজ্ঞানিক মুখ না তুলিয়াই জবাব দিলেন।

অপরূপা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিশেষে ডাকাডাকিতে অপরূপার ঘুম ভাঙিয়া গেল। দরজা খুলিয়া দিলেন। বৈজ্ঞানিক ঘরে প্রবেশ করিয়া অপরূপার বিছানায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া একটা দীর্ঘ পরিতৃপ্তির 'আঃ' শব্দ সৃষ্টি করিলেন। বলিলেন, একটু চা দেবে?

অপরূপা চা করিয়া দিলেন।

বলিলেন, হয়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ। -- গভীর প্রশান্তিতে বৈজ্ঞানিক জবাব দিলেন।

কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, অপরূপা তেমন আনন্দ করিতেছেন না। উঠিয়া পড়িলেন। ভোরের আকাশ কি সুন্দর দেখবে চল।

উভয়ে বাহিরে আসিলেন। অপরূপা বলিলেন, এখন কি হবে?

এখন টেস্ট হবে। -- বৈজ্ঞানিক বলিলেন, ভয় পেও না। মানুষ মেরে নয়।

তবে কি করে?

কুকুর, ভেড়া, ছাগল এইসব দিয়ে পরীক্ষা হবে।

এক মিনিটে এক হাজার মরবে?

আরও বেশি মরবে। মানুষ এক হাজার।

তারপরে?

তারপরের কথা পরে আলোচনা করা যাবে। -- বৈজ্ঞানিক অধীর কণ্ঠে বলিলেন, পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

পরীক্ষার আয়োজন চলিতে লাগিল। টেস্ট। প্রকাণ্ড একটা খোঁয়াড় প্রস্তুত করিতে হইল। কুকুর, ভেড়া, ছাগল যখন যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহারমধ্যে জমা হইতেছে। কুকুরের সংখ্যাই বেশি। এক-একটা কুকুর পিছু এক টাকা বকশিশ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ফলে শহর এবং আশেপাশের পথে-ঘাটে রোগাপটকা কুকুর যত ছিল খোঁয়াড়ে জমা হইতে লাগিল।

বৈজ্ঞানিক নিজে সমস্ত তদারক করেন। জন্তুগুলি শ্রেণী বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। খাইতে না দিলে পটকায় মারিবার পূর্বেই মরিয়া যাইতে পারে। সব দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে।

তিন চারটা ছাগল এক সঙ্গে বাঁধিয়া একজন লোক টানিয়া আনিতেছিল। ছাগজাতির চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী উহারা ক্রমাগত শুইয়া পড়িয়া আপত্তি জানাইতেছিল, এবং লোকটির হেঁচকা টানে অবিরাম আর্তনাদ করিতেছিল।

ক্রুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছুটিয়ে গেলেন, দড়িটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, কেন অযথা কষ্ট দিচ্ছ? ধীরে ধীরে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না?

বড় নিষ্ঠুর তোমরা।

অপরূপা একদিন খোঁয়াড় দেখিতে গেলেন।

দু হাজার পুরেছে? -জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রায় আর শ - দুয়েক। বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন। দু-একদিনের ভেতরে হয়ে যাবে। সবগুলোই মরবে ঠিক? -- অপরূপা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন। বৈজ্ঞানিক গভীর বেদনাহত দৃষ্টিতে স্ত্রীকে বিদ্ধ করিলেন। ধীর স্বরে বলিলেন, যদি একটাও না মরে, তাহলে তুমি সুখী হও?

সুখী? - অপরূপা অবলম্বনহীন শূন্যে ঝুলিতে লাগিলেন। বৈজ্ঞানিক বলিলেন, আমার পক্ষে তার অর্থ কি জান? মৃত্যু। আমার এতদিনের স্বপ্ন যদি ব্যর্থ হয় ভাবতে পার? অপরূপা আর ভাবিতে পারিলেন না। মাথা ঘুরিয়া পড়িতে গেলেন। বৈজ্ঞানিক ধরিয়া ফেলিলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। নানাবিধ জন্তু-জানোয়ারে দুই হাজার পূর্ণ হইয়াছে। নির্ধারিত তারিখ নিশ্চিত মৃত্যুর মত ঘনাইয়া আসিতেছে। আর বিলম্ব নাই। অপরূপা বলিলেন, আমি দেখতে যাব কিন্তু।

পাগল! ওর কাছাকাছি কারও যাবার জো আছে? -- বৈজ্ঞানিক স্তিমিত হাস্যে উড়াইয়া দিলেন।

তুমি যাবে না?

কেউ না।

তবে?

দূর থেকে দূরবীন দিয়ে দেখতে হবে।

অপরূপাও বৈজ্ঞানিক স্বামীর সঙ্গে দূর হইতে দূরবীন দিয়া দেখিবেন, স্থির হইল।

কিন্তু পটকাটা তবে ওখানে ফেলবে কে? -- অপরূপা আবার প্রশ্ন করিলেন।

বৈজ্ঞানিক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। -- একটু ধৈর্য ধর। সবই জানতে পারবে। এসব বিশ্লেষণ করবার মত অঢেল সময় নেই এখন।

মানসিক চাঞ্চল্য ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে মাত্র। স্ত্রীকে বৈজ্ঞানিক ভালবাসেন। অপরূপার ঠোঁট দুইটি গাঢ় অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছে -- না দেখিয়াও তিনি অনুভব করিলেন। ব্যথিত হইলেন।

কিন্তু সময় নাই। সময় একেবারে নাই। চঞ্চল বৈজ্ঞানিক মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অবশেষে সেই চরম মুহূর্ত আসিয়া পড়িল।

বৈজ্ঞানিক সংকেত দিলেন। পটকা নিক্ষেপক যন্ত্র হইতে পটকা ছুটিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর দম বন্ধ হইয়া গেল। বৈজ্ঞানিক জীবন আর মরণের মাঝখানে বায়ুহীন মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যেন।

ঐ-যে!

ধোঁয়া! খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে কিছু ধূম নির্গত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে বেগে উপরে উঠিতেছে। কিন্তু শব্দ? বৈজ্ঞানিক বার দুয়েক কান ঝাঁকিলেন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ? -- বৈজ্ঞানিক অপরূপাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

অপরূপা তাড়াতাড়ি বলিলেন, দুম করে একটা শব্দ হল মনে হল না?

মনে হল! -- বৈজ্ঞানিক দূরবীন ফেলিয়া ছুটিতে লাগিলেন। কোথায় যাচ্ছ? অপরূপা ব্যস্ত হইয়া পিছু লইলেন। যেও না, শোন।

বৈজ্ঞানিক শুনিলেন না।

অপরূপা ক্ষণেক পিছনে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু থামিলেন না। ক্ষণেক ছুটিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবশেষে সাংঘাতিক খোঁয়াড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধোঁয়া নাই। পোড়া পোড়া গন্ধ আছে। বিভিন্ন জন্তুর বিভিন্ন ধ্বনি মিলিয়া একটি মিশ্র জান্তব সুর একটানা কানে বাজিতেছে। একটা মৃত ছাগলের পাশে বৈজ্ঞানিক দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষে প্রাণহীন ভয়াবহ শূণ্য দৃষ্টি। অপরূপা ভয় পাইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিলেন।

আস্তে আস্তে হাত ছাড়াইয়া বৈজ্ঞানিক ফিরিলেন। অপরূপা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিতে লাগিলেন।

একটা তো মরেছে। অপরূপা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন। হ্যাঁ। পটকাটা ওর গায়ে পড়েছিল। বৈজ্ঞানিক আপন মনে বলিলেন। চলিতে চলিতে আবার বলিলেন, তোমার খুশি হবারই কথা। অপরূপা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু আমি খুশি হইনি। সত্যি বলছি।

খুশি উপচে পড়ছে তোমার চোখে মুখে। বৈজ্ঞানিক ধীর দৃঢ়স্বরে বললেন।

অপরূপার ক্ষীণ প্রতিবাদের চেষ্টা ডুবাইয়া দিয়া পুনরায় বৈজ্ঞানিক কহিলেন, কিন্তু। হবে। হবেই এই শেষ নয়, জেনে রেখো।

হতেই হবে। নইলে বিজ্ঞান মিথ্যা।

ফিরিয়া সোজা ল্যাবরেটরিতে ঢুকিলেন।

(শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৫৬)

সংবাদ - সাহিত্য

"ঘরে-বাইরে দেখতে যাচ্ছি। প্রতিবেশী, রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীসাধনবাবু দুখানা টিকিট কেটেছেন, আমাকেও নিয়ে যাবেন। বললেন, যাবার আগে পড়ে দেখুন দেশ-এর রিভিউটা, সুবিধে হবে। ৯ ফেব্রুয়ারির দেশ উনিই দিলেন। সূচীপত্র দেখে ৫৯-এর পাতা খুললাম -- **ঘরে বাইরে** প্রমীলা।

অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' পড়েছিলাম। গল্পটা ঠিক মনে ছিল না। কিন্তু সমালোচনাটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। সব মনে পড়ে গেল। নায়িকা প্রমীলার চরিত্রে যে মেয়েটি নেমেছে তাকে নিয়েই আলোচনা। আমাদের সুকুমারদার ছেলে দেবজিৎ -- অর্থাৎ ছবির পরিচালক, হিরোইন বৃন্দাকে এক ঝড়বৃষ্টির রাত্রে বৃন্দার ছাদের মনোরম ফ্ল্যাটে অভিনয়ের নির্দেশ দিচ্ছে। শুধু নির্দেশ নয়, পোজ, সিচুয়েশন, অঙ্গভঙ্গি সব শেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ডায়লগ একটু অদলবদল করে দেবজিৎ কি সুন্দর কথার মালাই না গেঁথেছে!

বৃন্দা বলছে: "আমি একটা মাত্র জিনিস নিয়েই মনে মনে গর্ব করি, জানো। সেটা হলো আমার একা থাকার ক্ষমতা। ...এক-জন মেয়ে হিসেবে কি করে অস্বীকার করি যে একা থাকার কিছু অসুবিধে আছে? কিন্তু এও বলবো, আজ আমি স্বাধীন। আমার যদি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে পূরণ করার অজস্র উপায় আমার আছে। তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ সময় একা কাটাই। এটা আমার ইচ্ছাকৃত নির্জনতা যা উপভোগ্য; কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহবধূর ক্ষেত্রে যা হয় তা হলো ইচ্ছাবিরুদ্ধ একাকিত্ব।"

খুবই চমৎকার, কিন্তু একটু খটকা লেগে গেল। পরিচালক বৃন্দাকে প্রশ্ন করছে "তুমি কোনদিন বিয়ে করার কথা ভাবো না?"

এটা কি রকম হল, দেবজিৎ ব্যাচেলার নাকি? রবীন্দ্রনাথের প্রমীলা তো বিবাহিতা ছিল, দুজন পুরুষের টানাপোড়েনে একটু বেকায়দায় পড়েছিল না? যাই হোক, যদি আসল বইয়ের খোল-নলচে পালটেও ফেলে থাকে দেবজিৎ তবুও মনে হয় রবিবাবুর লেখার চেয়ে সিনেমা অনেক ভাল হবে

'ঘরে বাইরে' রিভিউ কে লিখেছে জানি না কিন্তু স্টাইলটা একেবারে আধুনিক, দারুণ! ছবিটা দেখে সব জানাব।

গোপালদা"

*　　*　　*

পত্রটি পড়িয়া লজ্জায় মাথা কাটা গেল। কি সর্বনাশ! অনেকদিন যাবৎ আন্দাজ করিতেছি গোপালদার ভীমরতি হইতে চলিয়াছে -- কিন্তু এ যে একেবারে গোড়ায় গলদ, শেষরক্ষা হইলে বাঁচি। দেবজিৎ, প্রমীলা এসব কি তালগোল গোপালদা পাকাইয়াছেন!

তৎক্ষণাৎ 'দেশ'-মাতৃকার শরণাপন্ন হইলাম। ৫৯ পৃষ্ঠায় ঘরে বাইরে প্রমীলা ঠিক আছে। তবে সেটি সিনেমা-সমালোচনা নহে। গোপালদাও ঠিক দেখিয়াছেন কিন্তু সাগরময়ের হেঁয়ালি ধরিতে পারেন নাই। কারণ মাত্র কুড়ি পৃষ্ঠার ব্যবধানে ৭৯ নম্বর পাতায় আসল 'ঘরে-বাইরে', শীর্ষদেশে সি নে মা। সূচীপত্রে ইহার **উল্লেখ নাই** অতএব গোপালদা প্রতারিত হইয়াছেন। আসলের আলোচনা করিয়াছেন সমরেশ মজুমদার।

গল্প লেখক সমরেশ মজুমদারের একটি সচিত্র পরিচিতি আলোচ্য সংখ্যা **'দেশে' প্রকাশিত হইয়াছে** -- ১৯৮৪-র আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্তিতে। নিয়মমাফিক ছাঁদে সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থতালিকা, পুরস্কারপ্রাপ্ত বই সম্পর্কে আলোচনা। ইহার মধ্যে কয়েকটি প্রশংসাসূচক বাক্য আমাদের অতিমাত্রায় আকৃষ্ট করিল: "তাঁর কলমে এবং কব্জিতে জোর আছে।... ভাষাকে নির্ভুল দক্ষতায় হকিস্টিকের মতো উত্তমমধ্যম ব্যবহার করে চলেছেন।"

পরিচিতি-পাঠে মজুমদার মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যাহা বুঝিলাম তাহার পর ঘরে-বাইরে চিত্র-সমালোচনার নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাইবার কোনও চেষ্টা করিতে সাহসে কুলাইতেছে না। সমরেশবাবুর রাজনৈতিক জীবন যে দুই পার্টির আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের নাম শুনিলেও হৃৎকম্প হয়, হকিস্টিকের প্রপিতামহকে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করে। চিত্র-সমালোচনার কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথ বাঁচুন বা মরুন যায় আসে না, আমরা হকিস্টিকের উত্তমমধ্যমে ঘায়েল হইতে চাই না। ইহার মোকাবিলা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা মুসলিম লীগ করিতে পারেন।

সমরেশ-কৃত সিনেমা আলোচনার উদ্ধৃতি আমাদের ছোটখাট মন্তব্যসহ:

"ঘরে-বাইরে রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই অন্যতম বিশিষ্ট রচনা কিন্তু প্রথম সারির উপন্যাস নয়। যে যে গুণ থাকলে কোন রচনাকে ক্লাসিক আখ্যা দেওয়া হয়, 'ঘরে-বাইরে' সে গুণ থেকে বঞ্চিত।" [বিলো দি বেল্ট হকিস্টিক চালনা!]

"কখনও কখনও এমন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এদের [ঘরে-বাইরের চরিত্রগুলিকে] রক্তমাংসের চেহারা দেননি, পুতুলের মত চরিত্রগুলোকে নিজের আইডিয়াকে রূপ দিতে বাধ্য করেছেন।" [হকিস্টিকের দ্বিতীয় ঘা!]

"বর্তমান ফন্দিবাজ রাজনৈতিক নেতাদের চেহারা সন্দীপের আচরণে উন্মুক্ত করেছেন সত্যজিৎ রায়।" [কিন্তু কোন সাহসে?]

"কেন সন্দীপের আচরণে সন্দেহজনক গন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিমলা অত দ্রুত তাকে চুম্বনের অধিকার দিল... এ সব অবান্তর প্রশ্ন। কারণ ঘরে-বাইরে ছবিতে সত্যজিৎ রায় অনেক বেশি শিল্পী, সাধারণ গল্পকারের [বেচারা রবীন্দ্রনাথ!] ভূমিকা ছাড়িয়ে অনেক উচ্চমার্গে তাঁর বিচরণ।" [স্টিকের তৃতীয় এবং মোক্ষম ঘা!]

"[সন্দীপ নিখিলেশ] এই দুজন মিলিয়েই একটি মানুষ। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির ফ্রেমে ফ্রেমে এই মানুষটিকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথে বাস করে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছেন।" [রবীন্দ্রনাথ গতাসু ১৯৪১ খ্রীঃ!]

*

এ কোন সমরেশের পাল্লায় আমরা পড়িলাম! জগদ্বরেণ্য কথা-সাহিত্যিক সমরেশ বসু হইলে বলিতাম মাত্রাধিক্য। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সমরেশ চৌধুরী হইলে বলিতাম হারমোনিয়ামে স্কেল চেঞ্জের ফলে বেসুরা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ইঁহাকে কী বলিব? হকিস্টিকের জুজু আমাদের পাইয়া বসিয়াছে যে!

—০—

গত রবিবার মেঘলা এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় একটা সুখদায়ক শিহরণ হইতেছিল। বিকালের দিকে তেললঙ্কা সহযোগে মুড়িবাদামের মণিকাঞ্চনযোগ রচনা করিয়া ফেলিলাম। ঠোঙা হইতে মুড়ি তুলিয়া কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া অলসভাবে রাজা উজির মারিতেছি, মাঝে মাঝে ঠোঙায় হাত পড়িতেছে এবং পরক্ষণেই টেবিলের উপরে রাখা কাঁচালঙ্কা লইয়া কামড় চলিতেছে। সহসা ঠোঙার গায়ে একটি বিজ্ঞাপন নজরে পড়িল। কাহাকেও কিছু বলিলাম না, ভোজনশেষে ঠোঙাটিকে সযত্নে রাখিয়া দিলাম -- সময়মত দেখা যাইবে। রাজা উজিরবধে রাত্রি গভীর হইয়া গেল।

রাত্রে ঠোঙাটিকে চিরিয়া দ্রষ্টব্য অংশটুকু স্থির করিয়া লইলাম। শুধু বিজ্ঞাপনটাই আছে, কাগজের নাম নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই মস্তকের অভ্যন্তরে যে RAW -- রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকাল উইং আছে সেই-ই বিচার করিয়া বলিয়া দিল ইহা আনন্দবাজারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন। বিষয়বস্তু যখন আনন্দলোক তখন আনন্দবাজার না হইয়া উপায় কী?

অভাব এবং পয়সার লোভ মানুষকে -- শুধু মানুষই বা বলি কেন, একসংগে একগাদা একগোত্রীয় মানুষকে কোন্ নারকীয় স্তরে লইয়া যাইতে পারে তাহা দেখিয়া হতবাক হইয়া গেলাম। আনন্দলোকের কিছু বিজ্ঞাপনী অংশ আমাদের পত্রিকায় ছাপিয়া যদি এই অর্থ-পিশাচগণের সিদ্ধিলাভে কিছুটা সাহায্য করা যায় তবে আমরাও পিশাচসিদ্ধ হইতে পারি কি না এই চিন্তাই মগজকে আচ্ছন্ন করিল।

ছবি বাদে বিজ্ঞাপনটি ছাপিতেই হইল শেষ পর্যন্ত। সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলাম। তারিখটা ছিল ৫ ফাল্গুন -- পরবর্তী দিবস শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন ৬ ফাল্গুন। পরমহংসদেবই স্বপ্নে দেখা দিলেন। নির্দেশ দিয়া গেলেন, তাঁহার প্রিয় শিষ্য রাখালের প্রিয় শিষ্য ভক্ত গণের [?] পরিপোষিত -- বর্তমানে দীনাতিদীন, অর্থাভাবে বিপর্যস্ত আনন্দবাজার গ্রুপ অফ পাবলিকেশনসকে যেন সাধ্যমত সহায়তা করি।

শুধু পরমহংসদেবই নহেন, ঊর্ধ্বলোক হইতে আনন্দলোকের ওকালতি করিয়া ৫, ৬ ও ৭ ফাল্গুন স্বপ্নে জাগরণে আমাদের কাছে কাতর অনুরোধ করিতেছেন এই পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ রূপকারগণ। ইতিহাস স্বতন্ত্র ব্যাপার। আপাতত কিংবদন্তীর জয় হউক। কোনটারই বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, করিতে গেলেই কেঁচো এবং সাপ। আমরা আনন্দলোকের বিজ্ঞাপন এবং তার আগে আনন্দবাজারের হিতৈষীগণের তালিকা ছাপিলাম।

˚অশোককুমার সরকার, ˚প্রফুল্লকুমার সরকার, ˚সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ˚সরলাবালা সরকার, ˚গণেন মহারাজ, ˚রাখাল মহারাজ, ˚শ্রীমা সারদামণি, ˚শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

বিজ্ঞাপন˚:

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

'উৎসব' ছবিটি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অধিকাংশেরই আলোচ্য বিষয়, এই ছবিতে রেখা কতটুকু শরীর উন্মুক্ত করেছে, বা শরীরের কোন্ কোন্ অনাবৃত অংশ কতক্ষণ দেখা গেছে।

মুনমুন বলছেন:

'আমার শরীর কতটুকু দেখা গেল তা নিয়ে এত আলোচনা কেন? ...যদি শোবার ঘরের দৃশ্যে অভিনয় করি আর বায়না ধরি, একটুও গা দেখাবো না তা কি হয়?'

মধ্যরাত্রে শাবানার শাদী।

আমরা সেই 'আগামী সংখ্যা' দেখি নাই। প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। এইটুকু নিশ্চিত জানি, ওস্তাদ সার্ভেয়ারের দল নিপুণভাবে রেখা এবং মুনমুনের উন্মুক্ত অনাবৃত শরীরের যথাযথ জরিপ করিয়া মনোজ্ঞ রিপোর্ট আনন্দলোকের পৃষ্ঠায় দাখিল করিবেন। মধ্যরাত্রে শাবানার শাদীর নির্ভুল এবং নির্মম রিপোর্টও সেখানে বড় হেডলাইনে সুপ্রচারিত হইবে। কর্তাগণ ঠাণ্ডা-ঘরে বসিয়া যথাসময়ে ব্যালান্স সীট দেখিবেন। মোসাহেবের দল আসিয়া হাত কচলাইয়া লাভের অঙ্কের প্রতি কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিবে, দেখুন না, কয়েক সংখ্যার মধ্যেই লাড লাডলক লুইসেরও কল্পনার বাহিরে লইয়া যাইব। দেখুন না।

দেখিব। যতদিন বাঁচিব দেখিয়াই যাইব। ইহাও আমরা জানি সরকারকে শায়েস্তা করিতে সরকারই উপযুক্ত। কিন্তু কাক কাকের মাংস খায় না। □

বিবাহযোগ্য পাত্র–পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি–১ ফোনঃ ২৩–৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র–পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র–পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবন্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রে Exclusive Service-এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র–পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার । যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

–আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourages optimism. From 102 that month the **figure** has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

□ VOL. 1.No. 18 □ 23 FEBRUARY 1985 □ Regn No. 42168/84 □ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street, 3rd floor, Calcutta-700 017
Gram CENTPILES, Telex CENT IN CA-021-2331
Phones 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554

WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84